রবীন্দ্র মনীষা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র মনীষা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ক্লাসিক প্রেস

নিবেদন

আমাদের জীবনকালে রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উৎসব সারা বিশ্বে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষ নামক প্রাক্তন বৃটিশ উপনিবেশে রবীন্দ্রনাথ নামক সর্বতোমুখী প্রতিভার আবির্ভাব কি করে ঘটল, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর দুটি দশক অতিক্রান্ত হতে চলল। কিন্তু এই প্রতিভার সকল দিকের প্রতি আমাদের সমান মনোযোগ পড়ে নি। রবীন্দ্র-প্রতিভার অপেক্ষাকৃত অবহেলিত দিকগুলির প্রতি এই গ্রন্থে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের আরো কিছু আলোচনা অচির-প্রকাশিতব্য 'রবীন্দ্র-সমীক্ষা' গ্রন্থে করেছি। এই দিব্য প্রতিভার বহুমুখিতার প্রতি যদি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

আমার অনুজ শ্রীমান অজয়কুমার প্রেস-কপি তৈরি করে দিয়েছেন।

৩০ শে মার্চ, ১৯৬১
প্রেসিডেন্সি কলেজ,
কলিকাতা—১২

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

এই লেখকের—

বীরবল ও বাংলা সাহিত্য
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য
বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ
রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ
ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন
(ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগে)
রবীন্দ্র-সমীক্ষা (অচির প্রকাশিতব্য)
রবীন্দ্র-বিতান "
কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা "

যাঁর স্নেহ-সঙ্গ পেয়ে ধন্য হয়েছি
সেই সদ্যলোকান্তরিত কবি
পরিমলকুমার ঘোষের
স্মৃতির উদ্দেশে

সূচী—

ওরে মন,

যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অন্তর গগন।

তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,

গান গায় চন্দ্র তারা রবি॥

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়

সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এক ভাষণে বলেছিলেন, "জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।"

আর আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে প্রবেশের লগ্নে এক রচনায় লিখেছিলেন, "আমি সাধু নই সাধক নই, বিশ্বরচনার অমৃত-স্বাদের আমি যাচনদার, বার বার বলতে এসেছি ভালো লাগল আমার।"

জীবনপ্রেমী কবি—এই হল রবীন্দ্রনাথের সার্থকতম পরিচয়। বস্তুতঃ এর চেয়ে সার্থক আর কোনো অভিধায় রবীন্দ্রনাথকে ভূষিত করা সম্ভব বলে আমার জানা নেই।

কিন্তু আত্মপরিচয়দানে উৎসুক যে কবি, তাঁর কাছে আমরা যদি ঘটনাবহুল জীবনকাহিনী প্রত্যাশা করি, তাহলে নিশ্চিত ভুল করব। আধুনিক ত্বরা-তাড়িত পশ্চিমের প্রতি কবির মনোভাব সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল না এবং একাধিকবার সে-কথা বলেছেন। সংসারের উত্তেজনা, কীর্তি, খ্যাতি, ও আধুনিকতার প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না। সে কারণে রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়' পশ্চিমী প্রথার আত্মপরিচয় নয়, এতে ব্যক্তিগত জীবনের গূঢ় কাহিনী উদ্ঘাটনের প্রয়াস নেই, চাঞ্চল্যকর গোপন তথ্য প্রকাশের উত্তেজনা নেই, অহং-এর স্ফীত অভিমানকে বড়ো করে দেখবার ঝোঁক নেই। বস্তুতঃ ও-পথে গেলে আমরা কবিকে ও তাঁর সত্য পরিচয়কে পাব না।

জীবনী-রচনার ক্ষেত্রেও তাই, পশ্চিমী প্রথায় জীবনী রচনায় রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল না, সে-কথা তিনি বলেছেন! 'জীবনস্মৃতি'র ভূমিকাস্বরূপ কবি এ-কথাই লিখেছেন, "এই স্মৃতিচিত্রগুলিও সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী। ইহাকে জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে-হিসাবে এ লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক।" তাই কবির নিষেধাজ্ঞা 'কবিরে খুঁজিছ তাহারি জীবনচরিতে?' আর 'জীবনস্মৃতি'র শেষে মন্তব্য করেছেন, "মূর্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না।"

'জীবনস্মৃতি'র এই বক্তব্যই একটি সংহত বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধের সূচনায়—'আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম।' তাই জীবনকেই রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন ও তাঁর জীবনকে যিনি রচনা করে চলেছেন, তাঁকে 'জীবনদেবতা' নাম দিয়ে প্রণাম জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়ে'র এই ভূমিকা।

ভারতবর্ষ ও ইয়োরোপের জীবন-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়, এই সত্যটি উপলব্ধি করতে না পারলে 'আত্মপরিচয়ে'র মর্মসত্য অনুভব করা যাবে না। তাই গোড়াতেই এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধার করি।—

"য়ুরোপে মানুষের জীবনে দুইটি ভাগ দেখা যায়। এক শেখার অবস্থা, তাহার পরে সংসারে কাজ করিবার অবস্থা। এইখানেই শেষ।

কিন্তু, কাজ জিনিষটাকে তো কোনো-কিছুর শেষ বলা যায় না। লাভই শেষ। শক্তিকে শুদ্ধমাত্র খাটাইয়া চলাই তো শক্তির পরিণাম নহে, সিদ্ধিতে পৌঁছানোই পরিণাম। আগুনে কেবল ইন্ধন চাপানোই তো লক্ষ্য নহে, রন্ধনেই তাহার সার্থকতা, কিন্তু য়ুরোপ মানুষকে এমন-কোনো জায়গায় লক্ষ্য স্থাপন করিতে দেয় নাই, কাজ যেখানে তাহার স্বাভাবিক পরিণামে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে। টাকা সংগ্রহ করিতে চাও, সংগ্রহের তো শেষ নাই; জগতের খবর জানিতে চাও, জানার তো অন্ত নাই; সভ্যতাকে progress বলিয়া থাক, প্রোগ্রেস শব্দের অর্থই এই দাঁড়াইয়াছে যে, কেবলই পথে চলা, কোথাও ঘরে না পৌঁছানো। এইজন্যই জীবনকে না-শেষের মধ্যে হঠাৎ শেষ করা, না-থামার মধ্যে হঠাৎ থামিয়া যাওয়া য়ুরোপের জীবনযাত্রা। Not the game but the chase—শিকার পাওয়া নহে, শিকারের পশ্চাতে অনুধাবন করাই য়ুরোপের কাছে আনন্দের সারভাগ বলিয়া গণ্য হয়।...

এইখানে ভারতবর্ষ বলিয়াছেন, আর-সমস্ত পাওয়ার এই লক্ষণ বটে, কিন্তু এক জায়গায় পাওয়ার সমাপ্তি আছে। সেইখানেই যদি লক্ষ্য স্থাপন করি তবে কাজের অবসান হইবে, আমরা ছুটি পাইব। কোনোখানেই চাওয়ার শেষ নাই, জগৎটা এত বড়ো একটা ফাঁকি, জীবনটা এত বড়ো একটা পাগলামি হইতেই পারে না। মানুষের জীবনসংগীতে কেবলই অবিশ্রাম তানই আছে আর কোনো জায়গাতেই সম নাই, এ-কথা আমরা মানি না। অবশ্য এ-কথা বলিতে হইবে, তান যতই মনোহর হউক তাহার মধ্যে গানের অকস্মাৎ

শেষ হইলে রসবোধে আঘাত লাগে ; সমে আসিয়া শেষ হইলে সমস্ত তানের লীলা নিবিড় আনন্দের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়।

ভারতবর্ষ তাই কাজের মাঝখানে জীবনকে মৃত্যুর দ্বারা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইতে উপদেশ দেন নাই। পুরাদমের মধ্যেই সাঁকো ভাঙিয়া হঠাৎ অতলে তলাইয়া যাইতে বলেন নাই, তাহাকে ইষ্টিশনে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। সংসার কোনোদিন সমাপ্ত হইবে না, একথা ঠিক ; জীবসৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত উন্নতি-অবনতির ঢেউ-খেলার মধ্য দিয়া সংসার চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিরাম নাই। কিন্তু, প্রত্যেক মানুষের সংসার-লীলার যখন শেষ আছে, তখন মানুষ যদি একটা সম্পূর্ণতার উপলব্ধিকে না জানিয়া প্রস্থান করে, তবে তাহার কী হইল।...

এইজন্য ভারতবর্ষ মানুষের জীবনকে যেরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন, কর্ম তাহার মাঝখানে ও মুক্তি তাহার শেষে।" [ততঃ কিম্, 'ধর্ম']

আসল কথা এই, রবীন্দ্রনাথ কাব্য ও জীবন একসূত্রে গেঁথেছেন এবং কর্ম অপেক্ষা ধর্মকে, কীর্তি অপেক্ষা ধ্যানকে, মৃত্যু অপেক্ষা জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেবল মানবসংসার নয়, বিশ্বপ্রকৃতি কবির উপজীব্য ঃ এ-কথা রবীন্দ্রনাথ কখনোই বিস্মৃত হন নি, এ-কারণে বস্তুসত্য অপেক্ষা ভাবসত্যকে, সাংসারিক দুঃখ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক মুক্তিকামনাকে বড় বলে মনে করেছেন। এবং খুব স্পষ্টভাষায় কবি বলেছেন, "জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয় তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে ; জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ, তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে ; যাহা চোখের সম্মুখে মূর্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে ; যাহা অশরীর ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে, তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে ;—তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।" [আত্মপরিচয়—প্রথম প্রবন্ধ]

॥ ২ ॥

'আত্মপরিচয়' নানা কারণে মূল্যবান। রবীন্দ্রসাহিত্যের বিবর্তন, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম, তাঁর গভীর মানবপ্রীতি, তাঁর ধর্মবোধ অর্থাৎ দুঃখদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলকে ও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবনকে সত্য বলে জানবার সাধনা আন্তরিকভাবে এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

'আত্মপরিচয়ে'র প্রথম প্রবন্ধ ['বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত] রবীন্দ্রকাব্যের বিবর্তন ও জীবনদেবতা-সম্পর্কিত আলোচনার উৎসভূমি। আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনায় এই প্রবন্ধ আমাদের মুখ্য অবলম্বন। এটিকে উপলক্ষ করেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন, তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলেছিলেন, তা এখানে স্মর্তব্য ঃ "যে-আইডিয়া সম্বন্ধে আমরা প্রথমে অচেতন ছিলাম তাহাই যে আমাদিগকে বলাইয়াছে ও করাইয়াছে এবং আমাদের অপরিণত অবস্থারও কথা ও কাজকে আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই আইডিয়ারই শক্তি প্রবর্তিত করিয়াছে—আমার ক্ষুদ্র আত্মজীবনীতে এই কথাটার উপলব্ধিকে আমি কোনো একরকম করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। কথাটা সত্য কি মিথ্যা সে-কথা স্বতন্ত্র কিন্তু ইহা অহংকার নহে, কারণ ইহা কাহারও একলার সামগ্রী নহে। তবে কিনা যখন নানা কারণে নিজের জীবনবিকাশের মধ্যে এই আইডিয়াকে স্পষ্ট করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় তখন তাহাকে নিতান্ত সাধারণ কথা ও জানা কথা বলিয়া আর উপেক্ষা করিতে পারি না।"

এই প্রত্যুত্তরে বিশ্বাসের শক্তি ও প্রকাশের সাহস ব্যক্ত হয়েছে। সুদীর্ঘকালের কাব্যরচনার ধারা পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যে উপনীত হয়েছেন, "এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।... তাহাদের (কবিতাগুলির) রচয়িতার মধ্যে আর-একজন কে রচনাকারী আছেন।...এই যে কবি, যিনি আমাদের সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্যস্থাপন করিতেছেন, আমি, তাহা মনে করি না—আমি জানি,

অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন ;—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।"

এই কাব্যবিশ্বাসকে রবীন্দ্রনাথ জীবনসত্যরূপে গ্রহণ করেছেন এবং ছিন্নপত্র, সোনার তরী, চিত্রা ও নৈবেদ্য থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যের টেস্টামেণ্ট রূপে এই প্রবন্ধটিকে গ্রহণ করা যায়। প্রকৃতিরূপমুগ্ধ কিশোর কীভাবে জীবনসত্যকে উপলব্ধি করলেন, সংশয়-বেদনা-দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে কীভাবে শান্তিকে পেলেন ও হারালেন, তার বিচিত্র ইতিহাস প্রথম প্রবন্ধের অনুসৃতিতে তৃতীয় প্রবন্ধে ['আমার ধর্ম'] প্রকাশিত হয়েছে। এ'দুটি প্রবন্ধকে একত্র করে রবীন্দ্রকাব্য ও নাট্যের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রমানসের বিকাশের ধারাটি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'উৎসর্গ', 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী', 'রাজা', 'অচলায়তন' প্রভৃতি কাব্য ও নাটকে কবিমানসের বিস্তৃততর ও ব্যাপকতর পরিচয়টি সুন্দরভাবে উপস্থিত করা হয়েছে।

'ছিন্নপত্র'-'সোনার তরী' থেকে 'উৎসর্গ', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' থেকে 'রাজা' 'অচলায়তন' পর্যন্ত রবীন্দ্রসাহিত্যে গদ্য, কবিতা ও নাটকের বিচিত্র সমৃদ্ধ ধারার মধ্যে দিয়ে যে মহৎ জীবনশিল্পী নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তারই অন্তরঙ্গ পরিচয় এই দুই প্রবন্ধে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

মহৎ কবি ও মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ কি? এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাই পঞ্চম প্রবন্ধটিতে। কবি বলেছেন, "আসক্তি যাকে মাকড়সার মতো জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ করে দেয়, তাতে গ্লানি আসে, ক্লান্তি আনে। কেননা আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে—তার পরে তোলা-ফুলের মতো অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়। মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাছ থেকে। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী, রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেইখানেই তাঁর সত্যপ্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, লোভের কাছে তার স্থূল মাংস।"

মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ রবীন্দ্রনাথ এখানে নিপুণভাবে নির্ণয় করেছেন।

প্রথম ও তৃতীয় প্রবন্ধের আলোকে রবীন্দ্রসাহিত্যকে দেখলে আমরা এক মহৎ সাহিত্যসাধনা ও একজন মহৎ কবিকে পাই! তা আমাদের পরম লাভ। এই প্রবন্ধদুটি রবীন্দ্রসাহিত্যপ্রবেশক রূপে গণ্য হতে পারে।

কেবল রবীন্দ্রমানসের বিকাশের ধারাটি লক্ষ্য করেই আমাদের কৌতূহল ও আগ্রহের সমাপ্তি ঘটে না। জীবনদেবতা-তত্ত্বের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা প্রথম প্রবন্ধে পাই। কাব্যসাধনা সচেতন প্রয়াস নয়, তা অন্তরালবর্তী নিয়ন্তার ইচ্ছায় পরিচালিত, তাঁর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে কবি নিজেকে সার্থক মনে করেছেন ঃ এই ভাবটি এখানে বড় হয়ে উঠেছে। জীবনকে তিনি কর্মের দাপট বলে মনে করেন নি। 'করা' অপেক্ষা 'হওয়া'কেই জীবনের কাম্য বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন।

আর রবীন্দ্রকাব্যালোচনায় মানসসুন্দরী-জীবনদেবতা-লীলাসঙ্গিনী-প্রাণেশ-মধুর-হাসিনী-বিদেশিনী-রহস্যময়ী প্রভৃতি নামে ভূষিত যে কবিজীবন-নিয়ন্তার বারবার উপস্থিতি লক্ষ্য করি, তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় কবি এখানেই উদ্ঘাটন করেছেন।

'চিত্রা', 'অন্তর্যামী', 'জীবনদেবতা' কবিতায় কবি যাঁকে বরণ করেছেন, এখানে তাঁকে আরতি করে বলেছেন, "আমার অন্তর্নিহিত যে-সৃজনশক্তির কথা লিখিয়াছি, যে-শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপরূপান্তর জন্মজন্মান্তরকে একসঙ্গে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই 'জীবনদেবতা' নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম ঃ

"ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষা সম।"

কবি এখানে ক্ষান্ত না হয়ে আরো বলেছেন,

"কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন

বাসরশয়ন তব,—
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্যনব।”

রবীন্দ্রসাহিত্যে কসমিক চেতনার সূত্রপাত হয়েছে এখানে।

॥ ৩ ॥

'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ রবীন্দ্রনাথের সুগভীর প্রকৃতিপ্রেম এতে ব্যক্ত হয়েছে। কবিমানসের বিচিত্র আত্মোদ্ঘাটনের একটি ধাপ ঃ প্রকৃতিপ্রেম।

'নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মকতা' কবিমনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ছিন্নপত্র ও সোনার তরী রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমের সার্থক পরিচয়ভূমি, আত্মপরিচয়ে তারই সানন্দ স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি গদ্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করতে পারেন নি বলেই কবি বারবার ছিন্নপত্রের আশ্চর্যসুন্দর পত্র ও সোনার তরীর অনুরাগসিক্ত কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন।

আশ্চর্য লাগে, অনুরাগসিক্ত ছত্র ও চরণগুলিতে প্রকৃতিপ্রেম কত তীব্র, কত গভীর!

"এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে— এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে। এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক-ভূলোকের মাঝখানের সমস্ত শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য—এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে। কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! অত বড়ো আশ্চর্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ভিতর ভালো করে তার সাড়াই পাওয়া যায় না।"

এই ব্যাকুল আকর্ষণের পর কবির স্বীকৃতি, "পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে

আমিই মুগ্ধ, সেই মোহে আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।" রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান প্রত্যয় এই সংহত মন্তব্যে প্রকাশিত।

এই প্রকৃতিপ্রেমের অপর দিক মানবপ্রেম—সংসারপ্রীতি। পঞ্চম প্রবন্ধে কবির কি আশ্চর্য আনন্দময় স্বীকৃতি ঃ "আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহত বাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাকে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোটো শ্যামলা পৃথিবীকে ঋতুর আকাশ-দূতগুলি বিচিত্ররসের বর্ণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনদিন আলস্য করি নি। প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।"

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমের দিব্য অগ্নিস্পর্শে সাধারণ গদ্যবিবৃতি অসাধারণ কাব্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকৃতিপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধে আপন পরিচয় দিয়েছেন এই বলে, "আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি ছবি আঁকি, যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুক আনন্দে অধীর আমরা তাঁরই দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ। মানবকে গম্যস্থানে চালাবার দাবি রাখি নে, পথিকদের চলার সঙ্গে চলার কাজ আমার। পথের দুইধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশ্বর্য, যে ফুলপাতা, যে পাখির গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমরা আছি। যে-বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে, সুখদুঃখের আঘাতে-সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এই-ই আমার একমাত্র পরিচয়।"

চঞ্চলের লীলাসহচর রবীন্দ্রনাথের এই পরিচয় বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় হয়ে আছে।

॥ ৪ ॥

মানবপ্রেম ঃ সংসারপ্রীতি—রবীন্দ্রমানসের অপর পরিচয়। সে পরিচয়ের স্বাক্ষর 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে ছড়ানো রয়েছে।

পঞ্চম প্রবন্ধে কবির মানবপ্রেমের টেস্টামেণ্ট পাই—"আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।...আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা,—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।" পুনশ্চ-কাব্যে ও মানুষের ধর্ম ও Religion of Man ভাষণে যে মানবতার জয়ধ্বনি, এখানে তারই প্রতিধ্বনি শুনি।

এই গ্রন্থের শেষ (ষষ্ঠ) প্রবন্ধে 'আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে' দাঁড়িয়ে একই বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ নোতুন করে উপস্থিত করেছেন, বলেছেন, "মনে আশা করেছিলুম পৃথিবী থেকে অবসর নেবার পূর্বে একদিন নিখিল মানবকে সেই এক আত্মার আলোকে প্রদীপ্তরূপে প্রত্যক্ষ দেখে যেতে পারব। কিন্তু অন্তরের উদয়াচলে সেই জ্যোতিপ্রবাহের পথ নানা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তা হোক, তবু জীবনের কর্মক্ষেত্রে আনন্দের সঞ্চিত সম্বল কিছু দেখে যেতে পারলুম। এই আশ্রমে একদিন যে-যজ্ঞভূমি রচনা করেছি সেখানকার নিঃস্বার্থ অনুষ্ঠানে সেই মানবের আতিথ্য রক্ষা করতে পেরেছি যাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে অতিথিদেবো ভব। অতিথির মধ্যে আছেন দেবতা।"

নরদেবতাকে সংসারের সকল ক্ষেত্রে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন, বর্তমান গ্রন্থে তারই উজ্জ্বল উপস্থিতি।

॥ ৫ ॥

'আত্মপরিচয়ে'র অপর প্রধান পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের বিস্তৃত ব্যাখ্যান। দুঃখদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মঙ্গলকে ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে সত্য বলে জানবার সাধনাকে কবি এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সোনার তরী-

কল্পনা-নৈবেদ্য-উৎসর্গ-খেয়া-গীতালী কাব্য ও শারদোৎসব-রাজা-অচলায়তন-ফাল্গুনী নাটকের বক্তব্যকে কবি তাঁর বক্তব্যে সপ্রমাণ করতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেছেন, "আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তো তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে-প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আর-একদিকে অদ্বৈত; একদিকে বিচ্ছেদ, আর-একদিকে মিলন; একদিকে বন্ধন, আর-একদিকে মুক্তি।" ['আমার ধর্ম'; তৃতীয় প্রবন্ধ]

এই সাধনপথে দুঃখকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। ধর্মসাধনায় "যে-আনন্দ, সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়।...ধর্মবোধের এই যে যাত্রা, এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু তার পরে অমৃত। মানুষ এই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেননা জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে।......ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে এই অদ্বৈতে অমৃতে আনন্দে প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি, তারা পারে যাবে কী করে। সেইজন্যেই তো মানুষ প্রার্থনা করে, অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। 'গময়' এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।" [তদেব]

সেকারণেই কবি জ্যোতির্ময়কে অভ্যর্থনা করেছেন এই বলে,—

এস দুঃসহ, এস এস নির্দয়
তোমারি হউক জয়।
এস নির্মল, এস এস নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।

['নূতন প্রভাত', উৎসর্গ]

'শান্তিনিকেতন' ভাষণ-সংকলনে জীবন ও মৃত্যু, শক্তি ও প্রেম, স্বার্থ ও কল্যাণে যে দ্বন্দ্ব, তার সত্যকার সমাধানের পথনির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলেছেন, "জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে-মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে-লোক নিজে এগিয়ে

গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায় যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন।”

জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্কে এর চেয়ে বড়ো কথা রবীন্দ্রনাথ আর বলেন নি। ফাল্গুনী, পূরবী, পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি, শান্তিনিকেতন, প্রাচীন সাহিত্য, খেয়া, উৎসর্গ, প্রান্তিক, শেষসপ্তক, রোগশয্যায়, জন্মদিনে, শেষলেখা ঃ রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচিত্র পথে এই এক বক্তব্যই উপস্থিত। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে-প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে-শান্তি, তা বন্ধন, তা-ই মৃত্যু, সেজন্যেই তা অগ্রাহ্য। শারদোৎসব নাটকে কিশোর উপনন্দ দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে এই হল সত্যকারের সাধনা। নিরন্তর বেদনায় আত্মোৎসর্জনের দুঃখই আনন্দ, তাই শ্রী, তাই উৎসব। আবার ধর্ম কী? —এই আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে কবি বলেছেন, “অলস শান্তি ও সৌন্দর্যরসভোগ যে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ-কথা নিশ্চয় জানি। আমি স্বীকার করি আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি—কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে বর্জন-করা আনন্দ নয় দুঃখকে আত্মসাৎ-করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গল রূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই, তাকে ত্যাগ করে নয়; তার যে অখণ্ড অদ্বৈত রূপ, তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে তাকে অস্বীকার করে নয়।”

এই বক্তব্যকে রবীন্দ্রনাথ একটি আশ্চর্য কবিতায় প্রকাশ করেছেন। এ-ধরণের কবিতা তিনি নিজেই খুব কম লিখেছেন। কবির কথাতেই তা উদ্ধার করি, “ইহুদী পুরাণে আছে—মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে-লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই মৃত্যু নেই, কিন্তু যে-স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে মন্দের সংঘাত দিয়ে না জয় করতে পেরেছি, সে-স্বর্গ তো জ্ঞানের স্বর্গ নয়, তাকে স্বর্গ বলে জানিই নে। মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়, তাঁকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
যখন পড়ে,
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তোমার নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।

আঘাত হানি
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে-বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি—
দেখি বদনখানি।”

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ এই কঠিন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল কাব্য-জীবনে নয়, ব্যক্তিজীবনেও কবি এই দুঃখ আবাহনে কখনো পশ্চাৎপদ হন নি, দুঃখের মধ্যেই আনন্দকে আবিষ্কার করেছেন। এই আবিষ্কারের আলোয় রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয় আলোকিত হয়ে আছে।

চঞ্চলের লীলাসহচর রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়' আশ্চর্য গ্রন্থ। গভীর অনুভূতি ও উপলব্ধির উপর আত্মপরিচয়ের সত্য প্রতিষ্ঠিত। পঞ্চাশ থেকে আশি : এই তিরিশ বছরের মধ্যে লেখা ছ'টি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে-পরিচয় এখানে প্রকাশিত হয়েছে, তার আলোকে কবিকে আরো মহনীয় বলে মনে হয়। কিন্তু কবি কখনো মহত্ত্বের নিঃসঙ্গ শিখরচূড়ায়—পরিচিত পৃথিবী থেকে বহুদূরে—অধিষ্ঠান করতে চান নি। তিনি এই মর্তসংসারের জীবনস্রোতে ভেসে যেতে চেয়েছেন। এই গ্রন্থের পঞ্চম প্রবন্ধের শেষ ক'টি বাক্যে মর্তমমতার সুন্দর পরিচয় বিধৃত হয়েছে। তা উদ্ধার করে 'আত্মপরিচয়ের' পালা শেষ করছি। কবি বলেছেন, "লীলাময়ের ছন্দ মিলিয়ে [আশ্রমের] এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে, কখনো ছুটি দিয়ে এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ, আমার সার্থকতা। এর চেয়ে গম্ভীর হতে আমি পারব না ; শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে যারা আমাকে উচ্চ মঞ্চে বসাতে চান, তাঁদের আমি বলি, আমি নিচেকার স্থান নিয়েই জন্মেছি, প্রবীণের প্রধানের আসন থেকে খেলার ওস্তাদ আমাকে ছুটি দিয়েছেন। এই ধুলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি-ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।”

'আত্মপরিচয়' এই মর্তানুরাগের আলোয় দীপ্ত। বর্তমান গ্রন্থ রবীন্দ্র-সাহিত্যপ্রবেশক, রবীন্দ্রমানসের দর্পণ।

যে মৌলিক উপাদানে রবীন্দ্রনাথ গঠিত তা কবিত্বশক্তি। এই শক্তি তাঁকে কখনোই ত্যাগ করে নি, তার ফলে তাঁর সকল রচনায় কবিত্বের দীপ্তি ও যৌবন অনিবার্যরূপে বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনাকে কবিত্বের পটভূমিতেই দেখতে হয়। ছন্দ তাঁর মজ্জাগত, স্টাইল তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, রম্যতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের মুকুরে আধুনিক বাঙালির মনের ছায়া পড়েছে। গদ্যে তিনি ছন্দস্পন্দকে আবিষ্কার করেছিলেন। রবীন্দ্র-গদ্যের মধ্যে যে প্রবহমানতা বর্তমান, তাতে দ্রুতি ও বৈচিত্র্য, গাম্ভীর্য ও তরলতা, সরলতা ও ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়েছে, তার উৎস রবীন্দ্রনাথের কবিমন। পদ্যছন্দকে তিনি গদ্যে চালিয়ে দেন নি, গদ্যের প্রাণস্পন্দনকেই তিনি দ্যুতি ও ঐশ্বর্যদান করেছেন। তাই গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী—এ দুজনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত নন। তিনি বাংলা গদ্যের অশেষ বৈচিত্র ও রহস্যের স্রষ্টা। বোধ করি এই অর্থেই শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের গদ্য 'মহাকবির গদ্য, সুতরাং কোথাও পদ্যগন্ধী নয়।' অর্থাৎ মহাকবির প্রতিভার স্পর্শে গদ্যশিল্পের একটি অভিনব রূপ প্রকাশিত হয়েছে, পদ্যের অমিল কাটা-কাটা অনিয়মিত শব্দপরম্পরা গদ্যরূপে এখানে উপস্থিত হয় নি। সে-কারণে 'বিশ্বপরিচয়', 'বাংলাভাষা পরিচয়', 'লিপিকা', 'ছন্দ', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'সে', 'তিন সঙ্গী', 'যাত্রী' এবং নানাবিধ সমাজ-শিক্ষা সাহিত্য-দর্শন-রাজনীতি বিষয়ক গদ্যরচনায় বাংলা গদ্যের বিচিত্র বিভূতির পরিচয় দিয়েছেন। গদ্যের ছন্দস্পন্দনকে নানারূপে পরীক্ষা ও ধ্বনিমাধুর্যকে নানারূপে উদ্ভাবন করেছিলেন প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ—'লিপিকা'য় তার সূচনা, 'তিন সঙ্গী'তে পরিণতি। সমস্তটা মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্য—তা তীব্র, গভীর, কোমল, কঠিন, চতুর, সরল, সর্বোপরি বিচিত্র বৈভবে সমৃদ্ধ।

কবিতায় রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন, কিন্তু গদ্যরাজ্যে তা ঘটেনি। 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকেরা জানেন কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনের' একজন লুব্ধ পাঠক ছিলেন। উপন্যাস ও প্রবন্ধ এ দুই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রথম পর্বে বঙ্কিমের উপন্যাস ও প্রবন্ধের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'রাজর্ষি' ও 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রভাব যেমন প্রকট তেমনই 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩) ও 'আলোচনা' (১৮৮৫)—কিশোর রবীন্দ্রনাথের এ দু'টি প্রবন্ধ-পুস্তকে বঙ্কিমের

'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর প্রভাব তেমনই প্রকট। এই প্রভাব কেবল বিষয়বস্তুতে নয়, প্রকাশভঙ্গীতে—ভাষায়, আঙ্গিকে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে উপন্যাস ও প্রবন্ধে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা মূলতঃ বঙ্কিমী ভাষা। পদ্যে রবীন্দ্রনাথ যে পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, তা'তে আমাদের চমকে উঠতে হয়। 'মানসী' (১৮৯০) কাব্য আমাদের উনিশ-শতকী কাব্য-ঐতিহ্যের অনুগত নয়, তাকে সে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে এ কথা বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের গদ্যে প্রথম দিকে ব্যস্ততা ছিল না। ছিল মন্থরতা ও রক্ষণশীলতা—বঙ্কিম-প্রবর্তিত পথেই তিনি অনেকদিন চলেছেন। কিন্তু এটাই রবীন্দ্র-গদ্যের প্রথম পর্ব সম্পর্কে শেষ কথা নয়। বঙ্কিম-অনুসারী রক্ষণশীল সাধু গদ্য তিনি অর্ধ-জীবন ভোর ব্যবহার করেছেন গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধে। প্রাক্-'সবুজপত্র' পর্ব পর্যন্ত এই সাধু ভাষার অন্তরালে আরেকটি ধারা রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করেছিলেন—তা মুখের ভাষা—সাহিত্যে যা ছিল বিপাংক্তেয়। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন আঠারো বছর বয়সে; আর 'ছিন্নপত্র' (১৮৯৪) রচনা করেন চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সে; এগুলি জনসমক্ষে প্রচারের কথা লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ একবারও ভাবেন নি, তাই এই পত্র-গুচ্ছে তিনি 'স্বাধীনভাবে' মনের কথা মুখের ভাষায় লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই দ্বিধা ও সংকোচ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন 'সবুজপত্রে' (১৯১৪)। চলিত ভাষাকে তিনি সকল কাজের জন্য বরণ করে নিলেন; দীর্ঘ তিরিশ বছরের (১৮৮৩-১৯১৪) টানা-পোড়েন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল।

কিশোর রবীন্দ্রনাথের গদ্যের রূপ ছিল কি রকম? 'ভারতী' পত্রিকায় বাংলা ১২৮৮-৮৯ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩) থেকে কয়েকটি ছত্র তুলে দিচ্ছি—এ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক গদ্যের রূপ ও স্টাইল—এ দুইই লক্ষ্য করা যাবে।

"ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে, ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা, হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে, হৃদয়ের যেখানে দেবত্রভূমি যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।

যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহাকে ফুল দাও, কাঁটা দিও না; তোমার হৃদয় সরোবরের পদ্ম দাও, পঙ্ক দিও না। হাসির হীরা দাও, অশ্রুর মুক্তা দাও, হাসির বিদ্যুৎ দিও না, অশ্রুর বাদল দিও না।" ['মনের বাগান বাড়ি']

তারপর 'ভারতী' পত্রিকায় বাংলা ১২৯১-৯২ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন 'আলোচনা' (১৮৮৫) পুস্তক হইতে 'ডুব দেওয়া' শীর্ষক প্রবন্ধের 'এক কাঠা জমি'-র কয়েকটি ছত্র লক্ষ্য করা যাক।

"একদল লোক আছেন তাঁহারা যেখানে যতই পুরাতন হইতে থাকেন সেখানে ততই অনুরাগ সূত্রে বদ্ধ হইতে থাকেন। আর একদল লোক আছেন, তাঁহাদিগকে অভ্যাস সূত্রে কিছুতেই বাঁধিতে পারে না, দশ বৎসর যেখানে আছেন সেও তাঁর পক্ষে যেমন, আর একদিন যেখানে আছেন সেও তাঁহার পক্ষে তেমনি। লোকে হয়ত বলিবে তিনিই যথার্থ দূরদর্শী, অপক্ষপাতী, কেবলমাত্র সামান্য অভ্যাসের দরুণ তাঁহার নিকট কোন জিনিষের একটা মিথ্যা বিশেষত্ব প্রতীতি হয় না। বিশ্বজনীনতা তাঁহাতেই সম্ভবে। ঠিক উল্টো কথা। বিশ্বজনীনতা তাঁহাতেই সম্ভবে না।"

আর একটি প্রবন্ধ-সংকলন 'সমালোচনা'-র (১৮৮৮, ভারতী পত্রিকায় ১২৮৮-৮৯ সালে প্রকাশিত) একটি পুস্তক-সমালোচনা গ্রহণ করি। 'ডিপ্রোফণ্ডিস্' (ভারতী : আশ্বিন, ১২৮৮) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "টেনিসন এই কবিতাটিকে The Two Greetings কহিয়াছেন। অর্থাৎ ইহাতে তাঁহার সন্তানটিকে দুইভাবে তিনি সম্ভাষণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহার নিজের সন্তান বলিয়া, দ্বিতীয়ত তাঁহার আপনাকে তফাত করিয়া। এক তাঁহার মর্ত্যজীবন ধরিয়া আর এক তাঁহার চিরন্তন সত্তা ধরিয়া। একটিতে তাঁহাকে আংশিকভাবে দেখিয়া আর-একটিতে তাঁহাকে সর্বতোভাবে দেখিয়া। তাঁহার সন্তানের মধ্যে তিনি দুইভাগ দেখিতে পাইয়াছেন ; একটি ভাগকে তিনি স্নেহ করেন, আর একটি ভাগকে তিনি ভক্তি করেন। প্রথম সম্ভাষণ স্নেহের দ্বিতীয় সম্ভাষণ ভক্তির।" ['এক কাঠা জমি']

এটি পড়লেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সাধু-গদ্য রচনায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেছেন—ছোট ছোট কাটা কাটা বাক্য ও ক্রিয়াপদের বিরলতা এই লেখাটিকে গতি দিয়েছে।

'আলোচনা' ও 'সমালোচনা' গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধে ছোট ছোট বাক্যের সাবলীল গতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আবার কয়েকটি প্রবন্ধে গুরুগম্ভীর দীর্ঘ বাক্য আছে। 'লিপিকা'র যে স্টাইল তার খানিকটা আভাস পাই 'আলোচনা' গ্রন্থের (১৮৮৫) 'সৌন্দর্য ও প্রেম' প্রবন্ধে। সুন্দরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ, তাহার

কোনখানে বিরোধ-বিদ্বেষ নাই। ইন্দ্রধনুর রংগুলি প্রেমের রং, তাহাদের মধ্যে কেমন মিল! এই মিলই সুন্দরের নির্যাস। যাহাতে মিল নাই, তাহা সুন্দর নহে। যাহা সুন্দর তাহার হাতের সাধারণের সহিত আশ্চর্য মিল আছে। আমাদের মনই সৌন্দর্যপিপাসু। এইজন্য সুন্দরকে আমরা অবজ্ঞা করিতে পারি না। এখন যাহাদের মধ্যে এই সৌন্দর্যবোধ নাই, তাহাদের জন্য কে চেষ্টা করিবে? কবি।—তাঁহার কাজই হইতেছে আমাদের মনে সৌন্দর্য উদ্রেক করিয়া দেওয়া।"

ধর্ম-সম্পর্কিত রচনায় দেখা যায়—পরবর্তী—'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধধারার ভূমিকা রচিত হয়েছে এই বঙ্কিমী স্টাইলের অনুসারী সাধু গদ্যে। শান্তিনিকেতনে দশম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষ্যে পঠিত (৮ মাঘ, ১৩০৭ সাল) 'ব্রহ্মমন্ত্র' অভিভাষণের (১৯০০) কয়েকটি ছত্র এখানে তুলে দিচ্ছি।

"যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন দেখে সংসার তাহার নিকট একমাত্র মুখ্যবস্তু নহে—সে যাহা ভোগ করে তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া ভোগ করে—সে ধর্মের লীলা লঙ্ঘন করে না—নিজের ভোগমত্ততায় পরকে পীড়া দেয় না। সংসারকে যদি ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত না দেখি, সংসারকেই যদি একমাত্র মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া জানি তবে সংসার সুখের জন্য—আমাদের লোভের অন্ত থাকে না, তবে প্রত্যেক তুচ্ছ বস্তুর জন্য হানাহানি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, দুঃখ হলাহল মথিত হইয়া উঠে। এইজন্য সংসারীকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে—কারণ সংসারকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত জানিলে এবং সংসারের সমস্ত ভোগ ব্রহ্মের দান বলিয়া জানিলে তবেই কল্যাণের সহিত সংসার যাত্রা নির্বাহ সম্ভব হয়।"

এই ভাষণে দেখি দীর্ঘ পল্লবিত একাধিক বাক্যাংশযুক্ত সাধু বাক্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ শক্তি নিয়োগ করেছেন। বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠীর লেখকদের ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের গদ্যে এই লক্ষণটি ধরা পড়ে।

গল্পগুচ্ছের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সকল গল্পই সাধু ভাষায় লেখা। কিন্তু এই সাধু ভাষার রূপও পরিবর্তিত হয়েছিল। প্রথম গল্প 'ঘাটের কথার' রচনাকাল কার্তিক, ১২৯১ সালে (১৮৮৪)। দ্বিতীয় গল্প 'রাজপথের কথা' অগ্রহায়ণ, ১২৯১ সালে লেখা। এ দুয়ের ভাষণ বঙ্কিমী সাধু ভাষা—গুরুগম্ভীর, মন্থরগতি সংলাপ অংশও সাধু ভাষায়। 'ঘাটের কথা'র প্রথম কয়টি ছত্র দেখা যাক ঃ "পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে

সোপানে পাঠ করিতে পারিত। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও তবে আমার এই ধাপে বইস ; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।”

এরপর রচিত গল্প তৃতীয় গল্পটি—‘দেনাপাওনা’র রচনাকাল ১২৯৮ সাল (১৮৯১ খ্রীঃ)। এই গল্পের ভাষাও সাধু-ভাষা, কিন্তু এ ভাষা কত সাবলীল, কত স্বচ্ছন্দগতি, কত ভারমুক্ত। গোড়ার কয় ছত্র দেখুন : “পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপ মায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরুপমা। এ গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্ব্বে কখনও শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুর দেবতার নামই প্রচলিত ছিল—গণেশ-কার্ত্তিক-পার্ব্বতী তাহার উদাহরণ।”

এরপর থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের প্রথমাংশ গল্পগুচ্ছের সকল গল্পই সাধুভাষায় লেখা। কিন্তু দিনে দিনে তা’ আরো সাবলীল ও স্বচ্ছন্দগতি হয়ে উঠেছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক্।

(১) “লাবণ্যলেখা পশ্চিম প্রদেশের নব-শীতাগমসম্ভূত স্বাস্থ্য—এবং সৌন্দর্য্যের অরুণ পাণ্ডুরে পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া নির্ম্মল শরৎকালের নির্জ্জন নদীকূল লালিত অম্লান প্রফুল্ল কাশবনশ্রীর মতো হাস্যে ও হিল্লোলে ঝলমল করিতেছিল।” (রাজটীকা ; আশ্বিন, ১৩০৫)—বঙ্কিমী অনুপ্রাস ও সন্ধি-সমাসের আড়ম্বর এখানে আছে। কিন্তু এর সাবলীল গতি অক্ষুন্ন আছে।

(২) “আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণমান পরিবর্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে, হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমাকে কোন বেদুইন দস্যু, বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া জলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, তোমায় সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল। সেখানে সে কী ইতিহাস। সেই সারঙ্গীর সঙ্গীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত। কী অসীম ঐশ্বর্য, কী অনন্ত কারাগার। দুইদিক দুই দাসী

বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে। শাহেন শা বাদশা শুভ্র চরণের তলে মণি মুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে ; বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মতো হাবশি দেবদূতের মতো সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্য প্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে!" (ক্ষুধিত পাষাণ, শ্রাবণ, ১৩০২)—এখানে শব্দ ও অলঙ্কারের মেলা বসে গেছে। এই সুপ্রচুর আড়ম্বরের মধ্যে থেকে সাধু গদ্যকে রবীন্দ্রনাথ কী অনায়াসগতিতে চালনা করেছেন, তাই এখানে লক্ষণীয়।

(৩) "ঘাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময় হঠাৎ বলয়নিক্কণশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরাম অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময়প্রকাশের অবকাশ দিলনা। অপূর্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল। তাহার পর বুঝিতে পারিল, অনেক দিনের একটি হাস্যবাধায়-অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজল-ধারায় সমাপ্ত হইল।" ('সমাপ্তি', আশ্বিন, ১৩০০)—এখানে সন্ধি ও সমাসের ঘটা আছে। দীর্ঘ বিশেষণের বহুল ব্যবহার ঘটেছে, তথাপি এই স্বচ্ছন্দ গতি ক্ষুণ্ণ হয়নি।

(৪) "হায়, ভুল বলিয়াছিলাম। তুমি আমার আছ, একথাও স্পর্ধার কথা। আমি তোমার আছি, কেবল এইটুকু বলিবার অধিকার আছে। ওগো, একদিন কণ্ঠ চাপিয়া আমার দেবতা এই কথাটি আমাকে বলাইয়া লইবে। কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাকে থাকিতেই হইবে। কাহারও উপরে কোন জোর নাই; কেবল নিজের উপরেই আছে।" ('দৃষ্টিদান', পৌষ, ১৩০৫)—এখানে শব্দের ঐশ্বর্য বা সমাসের বাহুল্য নেই, সাধু গদ্যের ক্রিয়াপদকে রক্ষা করা হয়েছে, তা ঠিক্, কিন্তু এর চাল চলতি ভাষার চাল।

গল্পগুচ্ছের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড থেকে গৃহীত এই চারটি উদাহরণের ভাষা সাধু ভাষা। এগুলির মধ্যে রবীন্দ্র-গদ্যের প্রথম পর্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা যায়। সন্ধি-সমাসের বাহুল্য আছে, কিন্তু তা গদ্যের গতিকে মন্থর করেনি। বিশেষণ ও উপমা অজস্র আছে। দীর্ঘ বিশেষণ ও দীর্ঘ উপমা—দুই-ই রবীন্দ্রনাথ অনায়াস নৈপুণ্যের সংগে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই বিশেষণগুলি অনিবার্য, উপমাগুলি একান্ত স্বাভাবিক। স্তরে স্তরে উপমা রবীন্দ্রনাথ চয়ন

করেছেন। 'ক্ষুধিত পাষাণের' উদ্ধৃত অংশটিতে লক্ষ্য করা যায় বাক্যাংশের পর বাক্যাংশে কেমন অনায়াসে একটি সম্পূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

গুল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষা পুরোপুরি ব্যবহার করলেন সর্বপ্রথম 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে (শ্রাবণ, ১৩২১)। যখন 'সবুজপত্র' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষাকেই মেনে নিলেন, এ গল্প সেই সময়ে—১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা।

॥ ২ ॥

এই চলতি ভাষাকে গ্রহণ করার পিছনে কোন্ প্রেরণা কাজ করেছিল? তা কি বাইরের তাগিদ—প্রমথ চৌধুরীর উৎসাহ, না অন্তরের তাগিদ? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধের সূচনায় এ'কথা বলেছি, রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকে চলতি ভাষার চর্চা করেছেন। যখন 'আলোচনা', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'রাজর্ষি, 'বৌঠাকুরাণীর হাট' প্রভৃতি বঙ্কিমী ভাষায় লিখছেন, তখন প্রকাশ্য সভায় নয়, বৈঠকখানায় ও চিঠিপত্রে—'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' ও 'ছিন্নপত্র'-এ চলতি ভাষাকেই মেনে নিয়েছেন। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) তাঁর চলতি ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস, কিন্তু কোনমতেই প্রথম রচনা নয়। এর আগে তিনি লিখেছেন 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) 'পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণ' (১৮৯১), 'ছিন্ন পত্র' (১৮৯৪), 'শান্তিনিকেতন' বক্তৃতামালা, 'গোরা' উপন্যাসের (১৯১০) সংলাপের অংশ। হাস্যরচনা ও কৌতুক নাট্যগুলি, অচলায়তন (১৯১১) পর্যন্ত নাটক। 'সবুজ পত্র' এ ক্ষেত্রে মূল প্রেরণা স্থল নয়, তা নিমিত্ত মাত্র। এই চলতি ভাষার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা ইতঃপূর্বেই ঘটেছে। আঠারো বছর বয়সে লেখেন 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' আর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস লেখেন পঞ্চাশ পেরিয়ে। এই সুদীর্ঘকাল তিনি উপরোক্ত গ্রন্থগুলিতে পাত্র-পাত্রীর সংলাপে আচার্যরূপে প্রদত্ত ভাষণে ও আত্মীয় বন্ধুবর্গের নিকট লিখিত পত্রগুচ্ছে এই চলতি ভাষাই ব্যবহার করেছেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই সাধনার পরিপূর্ণ ফল আমরা পেলাম। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষার প্রথম সরকারী সাহিত্য রচনা (নাটক বা কৌতুক বাদ দিয়ে)। এই উপন্যাস থেকে শুরু হল নোতুন যাত্রা। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যে সাধুভাষাকে তিনি ব্যবহার করে এসেছেন, এখানে তা অবলীলাক্রমে ত্যাগ করলেন। অভ্যস্ত প্রথাকে

বর্জন করতে এতটুকু বাধলো না, আর কোনদিন জীবনের শেষ পর্যন্ত বাকি তিরিশ বছর আর কখনো পিছন ফিরে তাকালেন না। চলতি ভাষাকে বরণ করে ঘরে তুললেন, তা কি শুধু 'সবুজপত্রে' লেখার তাগাদায়? তা নয়; বাইরের তাগাদা হলে তা দুদিনে ফুরিয়ে যেত; জীবনের তিরিশ বছর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলবার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ নিজের ভিতর থেকেই পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের নির্মাতারূপে দেখা দিলেন। 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) থেকে 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) অন্তিম ভাষণ এই পর্ব সযত্নে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে চলতি ভাষাকে সাহিত্যের চিরস্থায়ী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

চলতি ভাষা কাকে বলে? সাধু ভাষা থেকে চলতি ভাষার পার্থক্য কোথায়? তা কি শুধু ক্রিয়াপদ আর সর্বনামের রূপ পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে? রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) উপন্যাসে এই প্রশ্নের জবাব দিলেন, প্রমাণ করলেন ক্রিয়াপদ আর সর্বনামের রূপ পরিবর্তনের উপর সাধু ও চলতি ভাষার প্রভেদ নির্ভর করে না। তিনি প্রমাণ করলেন, দুয়ের স্বকীয় চাল, বাগভঙ্গী ও বৈশিষ্ট্য আছে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে (১৯১৬) আর একদিক দেখা গেলো। রবীন্দ্রনাথের এই ভাষা পরীক্ষা আলোচনার আগে তাঁর প্রাক্-সবুজপত্র পর্বের চলতি ভাষার দু একটা নমুনা নেওয়া যাক।

আঠারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (বাং ১২৮৮ সাল, ইং ১৮৮১ খৃঃ প্রকাশিত) লিখেছেন। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল, কারণ কয়েকটি ছাড়া বাকী পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই। ......আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হয়েছে। আত্মীয়স্বজনদের সহিত মুখামুখী এক প্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর এক ভাষায় কথা কহা কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।" এ প্রসংগে পরে ২৯শে আগষ্ট, ১৯৩৬-এ কবি বলেছেন: "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে—সে হচ্ছে এর ভাষা! নিশ্চিত বলতে পারিনে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম। আজ এর বয়স হ'ল প্রায় ষাট। সে ক্ষেত্রে ত আমি ইতিহাসের দোহাই দিয়ে কৈফিয়ৎ

দাখিল করবো না। আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।" এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারে একে হাজির করতে লেখকের আপত্তি ছিল এই জন্যে যে, চিঠির ভাষা ও মুখের ভাষা এক হওয়া প্রয়োজন, একথা স্বীকার করলেও প্রকাশ্য সাহিত্য দরবারে এই চলতি ভাষার ঠাঁই হতে পারে—তা তিনি ভাবেন নি। সে কথা ভেবেছিলেন পরে—'ছিন্নপত্রের' আমলে—দশ বছর পরে—সে চিঠিগুলিকে সহিত্যের প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত করতে তিনি ইতস্ততঃ করেন নি। এখন 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রের' তৃতীয় পত্র থেকে একটু তুলে দিচ্ছি—চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতা দেখাবার জন্য। একটি বল-নাচের বর্ণনা: "নাচ আরম্ভ হল। ঘুর-ঘুর-ঘুর। একটা ঘরে মনে করো চল্লিশ পঞ্চাশ জুড়ি নাচছে, ঘেঁষাঘেঁষি, ঠেলাঠেলি কখনো বা জুড়িতে জুড়িতে ধাক্কাধাক্কি। তবু ঘুর-ঘুর-ঘুর। তালে তালে বাজনা বাজছে তালে তালে পা পড়ছে, ঘর গরম হয়ে উঠছে। একটা নাচ শেষ হলো বাজনা থেমে গেল, নর্তক মহাশয় তাঁর শ্রান্ত সহচরীকে আহারের ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে টেবিলের উপর ফলমূল-মিষ্টান্ন-মদিরার আয়োজন; হয়তো আহার পান করলেন, না হয় দু'জনে নিভৃতে কুঞ্জে বসে রহস্যালাপ করতে লাগলেন। আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড়ো মিলে মিশে নিতে পারিনে, যে নাচে আমি একেবারে সুপণ্ডিত, সে নাচও নতুন লোকের সঙ্গে নাচতে পারিনে, সত্যি কথা বলতে কি, নাচের নেমন্তন্নগুলো আমার বড়ো ভালো লাগে না।"

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী' পুস্তকে (১৩২১ বাং, ১৮৯১ ইং) য়ুরোপের উদ্দেশে যাত্রার সূচনায় ২২শে আগষ্ট, ১৮৯১ তারিখের দিনলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: "তখন সূর্য অস্তপ্রায়। জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারত বর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলুম। সমুদ্রের জল সবুজ, তীরের রেখা নীলাভ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে এবং জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছে। বামে বোম্বাই বন্দরের এক দীর্ঘরেখা এখনো দেখা যাচ্ছে; মনে হলো আমাদের পিতৃপিতামহের পুরাতন জননী—সমুদ্রের বহুদূর পর্যন্ত ব্যাকুল বাহু বিক্ষেপ করে ডাকছেন, বলছেন, আসন্ন রাত্রিকালে অকূল সমুদ্রে অনিশ্চিতের উদ্দেশে যাসনে; এখনো ফিরে আয়। ক্রমে বন্দর ছাড়িয়ে গেলুম। সন্ধ্যার মেঘাবৃত অন্ধকারটি সমুদ্রের অনন্ত শয্যায় দেহ বিস্তার করলে। আকাশে তারা নেই, দূরে লাইটহাউসের আলো জ্বলে উঠল। সমুদ্রের শিয়রের কাছে

সেই কল্পিত দীপশিখা যেন ভাসমান সন্তানদের জন্য ভূমিমাতার আশঙ্কাকুল জাগ্রত দৃষ্টি।"

'ছিন্নপত্রে' জানুয়ারী, ১৮৯১ তারিখ-অঙ্কিত কালীগ্রাম থেকে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: "এই যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি! ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছা করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি, এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম। স্বর্গ আর কি দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা-দুর্বলতাময় এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত। আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্র, স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র সত্য হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পারিনে, বাঁচাতে পারিনে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য সে করেছে।"

শিলাইদা থেকে ২১শে জুলাই, ১৮৯২ তারিখের এক পত্রে লিখছেন: "কাল বিকেলে শিলাইদহে পৌঁছেছিলুম, আজ সকালে আবার পাবনায় চলেছি, নদীর যে রোখ, যেন লেজ-দোলানো কেশর-ফোলানো তাজা বুনো ঘোড়ার মতো, গতি গর্বে ঢেউ তুলে ফুলে ফুলে চলেছে—এই খেপা নদীর উপর চড়ে আমরা দুলতে দুলতে চলেছি, এর মধ্যে ভারি একটা উল্লাস আছে। এই ভরা নদীর যে কলরব সে কী আর বলব। ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করে কিছুতে যেন আর ক্ষান্ত হোতে পারছে না, ভারি একটা যৌবনের মত্ততার ভাব।"

প্রাক্-সবুজপত্র-পর্বের চলতি ভাষায় রচনার আর দুয়েকটি উদাহরণ পরীক্ষা করা যাক্। পূর্বধৃত উদাহরণগুলি চিঠিপত্র, তা প্রকাশ্য সাহিত্যসভার জন্য উদ্দিষ্ট নয়, একথা স্মর্তব্য। 'স্বদেশ' গ্রন্থের (১৯০৭) 'নূতন ও পুরাতন', 'শিক্ষা' (১৯০৮) গ্রন্থের 'শিক্ষার মিলন', 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের (১৯০৭) 'নানা কথা', এবং 'শান্তিনিকেতন' (১৯১০) ভাষণ সঙ্কলনের 'শ্রাবণসন্ধ্যা'—অন্ততঃ এই চারিটি প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারে রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষার আধারেই উপস্থিত করেছেন।

'নানাকথা' প্রবন্ধে (১২৯২ বাং, ১৮৮৫ ইং) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:, 'মানুষের

হৃদয় ছড়িয়ে আছে, মিলিয়ে আছে, পৃথিবীর আলোয় ছায়ায়, তার গন্ধে, তার গানে। অতীতকালের সংখ্যাতীত মানুষের প্রেমে পৃথিবী যেন ওড়না উড়িয়ে আসে; বায়ুমণ্ডলে যেমন তার বাষ্পের উত্তরীয় এ তেমনি তার চিন্ময় আবরণ; এর মধ্য দিয়ে মানুষ রঙ পায় সুর পায় আপন চিরন্তন মনের। তাই যখন শুনি আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সময়েও 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানু' দেখা যেত, তখন আপনাদের মধ্যে সেই পূর্বপুরুষদের চিত্ত অনুভব করি, তাঁদের সেই মেঘ দেখার সুখ আমাদের সুখের সঙ্গে যুক্ত হয়; বুঝতে পারি, যাঁরা গেছেন তাঁরাও আছেন।"

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে (১৩০৮ বাং) বলছেন: "আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্বভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধন সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর মহলে তার আসন পড়বে।"

'শ্রাবণসন্ধ্যা' প্রবন্ধে (শ্রাবণ, ১৩১৭ বাং) বলছেন: "আজ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে জগতে আর যত-কিছু কথা আছে সমস্তকেই ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে; মাঠের মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড়—এবং যে কখনো একটি কথা জানে না সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে। অন্ধকারকে ঠিকমতো তার উপযুক্ত ভাষায় কেউ যদি কথা কওয়াতে পারে তবে সে এই শ্রাবণের ধারাপতনধ্বনি। অন্ধকারের নিঃশব্দতার উপরে এই ঝর্ঝর্ কলশব্দ যেন পর্দার উপরে পর্দা টেনে দেয়, তাকে আরো গভীর করে ঘনিয়ে তোলে, বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনে। বৃষ্টিপতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার।"

প্রাক্-সবুজপত্র-পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাই চলতি ভাষার ব্যবহার মাঝে মাঝেই করেছেন, এর চর্চা কখনো সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন নি। কিন্তু এই পর্ব মূলত সাধুভাষার পর্ব। এই পর্বে তিনি সাধু গদ্য রচনায় চরম নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'শিক্ষা', 'স্বদেশ', 'সমূহ', 'রাজাপ্রজা', 'সমাজ', 'পঞ্চভূত', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'আত্মশক্তি', 'স্বদেশী সমাজ', 'চরিত্র পূজা', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'আধুনিক সাহিত্য': প্রথম মহাযুদ্ধের আগে প্রকাশিত এই সব প্রবন্ধ-পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ সাধু গদ্য রচনায় অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। এই সকল সুপরিচিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া বাহুল্য মাত্র। কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করছি যাতে এই নিপুণতার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাবে: 'ছাত্রদের প্রতি

সম্ভাষণ' (শিক্ষা), 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ও 'নববর্ষ' (স্বদেশ), 'মেঘদূত' ও 'শকুন্তলা' (প্রাচীন সাহিত্য), 'বঙ্কিমচন্দ্র' (আধুনিক সাহিত্য), 'কেকাধ্বনি', 'নববর্ষ', 'পাগল' ও 'শরৎ' (বিচিত্র প্রবন্ধ)।

॥ ৩ ॥

'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) ও 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬)—এই দু'টি উপন্যাসই সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রসাহিত্যে—সাধু ও চলিত গদ্য—এই দুই ধারার অবসান ঘটল। রবীন্দ্রনাথ চলিতকে বরণ করে নিলেন, পঞ্চাশ বৎসরের অভ্যস্ত সংস্কার ত্যাগ করে গেলেন।

'চতুরঙ্গে' কেবল বিবরণ নয়, সংলাপও সাধু ভাষায় লেখা। কিন্তু তার মধ্যে চলতি ভাষার সাবলীলতা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এ বইয়ের ভাষা সংহত, চাপা, তবু তাকে ঠেলছে ভেতর থেকে। সাধারণতঃ সাধুভাষায়—আমরা যে সব ক্রিয়াপদ ব্যবহার করি, তার ব্যবহারেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি, চলতি ক্রিয়াপদকেও ঠাঁই দিলেন। ক্রিয়াপদের রূপভেদে সাধু ও চলিত ভাষার যে ব্যবধান এতদিন ছিল, তাকে তিনি ভেঙে দিলেন।

নীচের উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করা যাক্ ঃ

"শচীশ তামাক সাজিয়া তাঁর হাতে দিয়া তাঁর পায়ের দিকে মাটির উপরে বসিল। স্বামী তখনই শচীশের দিকে পা ছড়াইয়া দিলেন। শচীশ ধীরে ধীরে তাঁর পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

দেখিয়া আমার মনে এতবড় একটা আঘাত বাজিল যে, ঘরে থাকিতে পারিলাম না। বুঝিয়াছিলাম আমাকে বিশেষ করিয়া ঘা দিবার জন্যই শচীশকে দিয়া এই তামাক-সাজানো ; এই পা-টেপানো।

স্বামী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, অভ্যাগত সকলের খিচুড়ি খাওয়া হইল। বেলা পাঁচটা হইতে আবার কীর্তন শুরু হইয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত চলিল।

রাত্রে শচীশকে নিরালা পাইয়া বলিলাম, "শচীশ জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ কী বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু কি এতবড় মৃত্যু।'

এই উদ্ধৃতির নিম্নরেখ শব্দগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, সাধু ও চলিত গদ্যে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের রূপের বিভিন্নতা কী ভাবে অগ্রাহ্য হয়েছে। চলতি

ভাষার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে উন্মুখ হয়ে উঠেছেন পূর্বদ্ধৃত উদ্ধৃতিগুলিতে যে
প্রবণতা ছিল, তা যে সীমা লঙ্ঘন করে যেতে চাইছে, তা এ থেকে অনায়াসেই
বোঝা যায়। 'চতুরঙ্গের' সংহত, কাটছাঁট বাক্য যে ভেতরে ভেতরে আবেগে
উদ্দাম হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ—এর পরই রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হলো
'ঘরে বাইরে' উপন্যাস।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বাহন আগাগোড়াই চলতি ভাষা। তাতে রবীন্দ্রনাথ
যেন চলতি গদ্যের তরঙ্গ বাজিয়ে গেলেন। 'চতুরঙ্গে'র সংহতি ও সংযম থেকে
আমরা মুহূর্ত মধ্যে উত্তীর্ণ হলাম উচ্ছলতা ও ঘূর্ণিপ্রবাহে। এ উচ্ছলতা চলতি
গদ্যের, এ ঐশ্বর্য ভাষার ঝকমকে অলংকারে—বিরোধাভাসে, অনুপ্রাসে, যমকে,
শ্লেষে। 'ঘরে বাইরে'র সূচনাতেই আমরা এই উচ্ছ্বাস, অতিরিক্ত অলংকরণ
লক্ষ্য করি। চলতি ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ যে, সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনেছেন, তা
বোঝাবার জন্য হয়ত বা এই অতিরিক্ততার চমক লাগিয়েছেন। বাংলা গদ্যের
মুক্তিসাধনে 'ঘরে বাইরে' তাই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রইল। এ উপন্যাসের
সূচনাটি লক্ষ্য করা যাক্, "মাগো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর,
সেই লালপেড়ে শাড়ী, সেই তোমার দু'টি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গম্ভীর। সে
যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার
জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার
পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মত ছুটে এল? সেই আমার আলোর
সম্বল কি এক কণাও রাখল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই যে উষা
সতীর দান; দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?" এই স্টাইল
সম্পূর্ণভাবেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। প্রশ্নভঙ্গির বাহুল্য, হ্রস্ব বাক্য, উপমার
আতিশয্য, 'সেই' ও 'সে যে' পদের বহুলতা—এগুলি হয়ত সরকারী ভাবে চলতি
গদ্য রচনার প্রথম প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া যখন রবীন্দ্রনাথ সাম্‌লে
গেলেন, তখন তিনি 'শেষের কবিতা'র অর্থালংকারের মোহে, ঔজ্জ্বল্যে ধরা
দিলেন—ভাষাপ্রসাধনে মন দিলেন।

সে কথা আলোচনার আগে দুটী বিষয় স্মর্তব্য। 'ঘরে-বাইরে'তে দেখেছি
চলতি গদ্যের ঐশ্বর্য। প্রাক্-সবুজপত্র পর্বে আমরা সাধু গদ্যের ঐশ্বর্যময় রূপ
প্রত্যক্ষ করেছি 'প্রাচীন সাহিত্য' 'বিচিত্র প্রবন্ধ' 'স্বদেশ' প্রবন্ধ পুস্তকে। সাধু
গদ্যের ঐশ্বর্যরূপকে একবার মাত্র 'ঘরে-বাইরে'র চলতি ভাষার ঐশ্বর্যরূপের পাশে
উপস্থিত করতে চাই। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র 'কেকাধ্বনি' (রচনা: ১৩০৮ বাং—

১৯০১) প্রবন্ধের একটি অনুচ্ছেদ এখানে তুলে দিলাম : "কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থান বিশেষে সময়বিশেষে মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই মিষ্টতার স্বরূপ কুহুতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র, নববর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারই গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতর-ঘনায়িত অন্ধকারে মাতৃস্তন্যপিপাসু উধ্বর্বাহু শত সহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখা-প্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে, রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্যক্রেংকার-ধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান, কান তাহার মাধুর্য জানে না, মনই জানে। সেইজন্যই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকখানি পায়, সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।"

এই অংশে গুরুগম্ভীর সংস্কৃত প্রধান ভাষার ধ্বনিরোল আমাদের হৃদয়ে যে দোলা দেয়, তাকে কোনোক্রমেই 'সাধু' গদ্য বলে দূরে ঠেলে রাখতে পারি না।

আর একটি কথা। রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর বয়সে—সবুজপত্র-পর্বের ঠিক আগে—'জীবনস্মৃতি' (১৯১২) রচনা করেন। এর ভাষা সাধু গদ্য। তবু এতে যে নমনীয়তা, সাবলীলতা ও প্রাখর্য আছে, তা বিস্ময়কর। 'জীবনস্মৃতির' স্টাইল একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথেরই। এ বিষয়ে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করি : "রবীন্দ্রনাথের মধ্য বয়সে লিখিত এই বইখানি রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যমণির মতো দুলিতেছে। ইহার পূর্বের ও রবীন্দ্রনাথের স্টাইল সম্বন্ধে লোকের মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু জীবনস্মৃতির স্টাইল সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র সকলে একমত। এই বইখানিতে কবি সকলের মন হরণ করিয়া লইয়াছেন।" (রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর : পৃঃ ৯)। জীবনস্মৃতির সূচনা থেকে কয়েকটি ছত্র তুলে দিয়ে এই স্টাইলের সাক্ষাৎ পরিচয় দিচ্ছি : "স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যে-ই আঁকুক, সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে অভিরুচি তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কতো বড়োকে ছোট করে, ছোটোকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিষকে পাছে ও পাছের জিনিষকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র

দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়। কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম জীবন বৃত্তান্তের দুইচারিটি মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে, তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে দানা রঙ পরিয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে, সে রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের; সে রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে চাহিয়াছে, সুতরাং পটের উপর যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।" তারপর বিশ বছর বয়স পর্যন্ত যে জীবন, সে পর্ব্বের আনন্দবেদনা মিশ্রিত স্মৃতিচিত্রগুলি অননুকরণীয় ভাষায় এঁকে গেছেন।

ভাবলে আশ্চর্য লাগে, সাধু গদ্যের পরিপূর্ণ ও মহৎ রূপটি আয়ত্তে পাবার পর রবীন্দ্রনাথ চিরদিনের জন্য তার চর্চা ছাড়লেন। যিনি প্রাচীন সাহিত্য, বিচিত্র প্রবন্ধ, জীবনস্মৃতি লিখেছেন, তিনি যে আর কোনদিন সাধু গদ্যের চর্চা করলেন না একথা ভাবতেও কষ্ট হয়। তবু তাই সত্যি। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ চলতি গদ্যকেই মেনে নিলেন এবং শিরোপা দিলেন। এই ভাষা তাঁর পরবর্তী সকল গদ্য রচনায় দেখা গেছে। 'গল্পগুচ্ছে'র তৃতীয় খণ্ডে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 'অতিথি' বা 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের অপূর্ব্ব সমৃদ্ধ সাধু গদ্যকে রবীন্দ্রনাথ অবলীলাক্রমে পিছনে ফেলে এলেন। চলতি গদ্যে লিখলেন 'স্ত্রীর পত্র' (শ্রাবণ, ১৩২১ বাং। ১৯১৪ ইং), এই পত্রটি কেবল নারীর মর্যাদা ও অধিকার ঘোষণা করেছে, তা নয়, গল্পরাজ্যে ভাবে ও ভাষায় মূর্তিমান বিদ্রোহরূপে দেখা দিয়েছে। এর ভাষার এমন একটি পার্থক্য ও তীক্ষ্ণতা আছে যা আমাদের প্রতি ছত্রেই সচেতন করে তোলে। সূচনা থেকে একটু তুলে দিচ্ছিঃ "আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখিনি! চিরদিন কাছেই পড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেছো, আমিও শুনেছি। চিঠি লেখবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায়নি। আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আফিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই, সে তোমার দেহ-মনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে। তাই তুমি আফিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না।

বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল, তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন। আমি তোমাদের মেজবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজবউয়ের চিঠি নয়।"

এই চলতি গদ্য—কথ্য ভাষা হয়েও পুরোপুরি মুখের কথা নয়। সাহিত্যিক চলতি ভাষার যথার্থ রূপটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। এই ভাষায় একটি সযত্ন প্রসাধনের ও শালীন প্রকাশের পরিচয় পাই। 'ঘরে-বাইরে'র চলতি ভাষায় যে আড়ম্বর, তা প্রথম প্রকাশের আড়ম্বর। অলংকারের সেখানে বাহুল্য, প্রসাধন সেখানে উগ্র। কিন্তু এই ভাষায় সেই উগ্রতা ও আতিশয্য দূর হয়েছে। এই গল্পেরই আর ক'টি ছত্র লক্ষ্য করা যাক্ঃ 'যেমন করেই রাখ, দুঃখ যে আছে একথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসেনি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো, মনে ভয়ই হ'ল না। জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদর যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তাহলে আল্‌গা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড় শুদ্ধ আমি তেমনি করে উঠে আসতুম। বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু, এমন মরায় বাহাদুরিটা কী। মরতে লজ্জা হয়, আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।"-- ('স্ত্রীর পত্র') এখানে লক্ষণীয় কী নৈপুণ্যে নিরুচ্ছ্বাসকণ্ঠে এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। এরপর 'পয়লা নম্বর' (আষাঢ়, ১৩২৪। ইং ১৯১৭), 'পাত্র ও পাত্রী' (পৌষ, ১৩২৪) প্রভৃতি পরবর্তী গল্প এই চলতি গদ্যেই লেখা হয়েছে।

॥ ৪ ॥

রবীন্দ্র-গদ্যের বিবর্তনে এর পর নাম করতে হয় 'লিপিকা' (১৯২২) বইটির। এর কথিকাগুলি 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার ১৯১৯-২০ তে প্রকাশিত হয়। গদ্য ও পদ্যের সীমানায় অবস্থিত এই বইটি গদ্যছন্দের অগ্রদূত। সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এখানে দেখব এর ভাষার সাবলীলতা ও প্রাখর্য। রবীন্দ্রনাথ যে কী পরিমাণ গ্রহণশীল ও উদার ছিলেন, তার প্রমাণ এ বইয়ের ভাষা। সংস্কৃত থেকে দেশী বিদেশী শব্দ-নির্বিচারে সবকিছুই প্রয়োজন মতো তিনি

এখানে গ্রহণ করেছেন, অথচ কোথাও ভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি, স্ল্যাং-এ পরিণত হয়নি।

সংস্কৃতপ্রধান ভাষার নমুনা: "সেই আকাশ পৃথিবীর বিবাহ-মন্ত্র গুঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের 'পরে। প্রিয়ার মধ্যে যা অনির্বাচনীয় তাই হঠাৎ বেজে-ওঠা বীণার তারের মতো চকিত হয়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির পরে তুলে দিক দূর বনান্তের রংটির মতো তার নীলাঞ্চল। তার কালো চোখের চাহনীতে মেঘ মল্লারের সব মীড়গুলি আর্ত হয়ে উঠুক। সার্থক হোক বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে।" ('মেঘদূত')

দেশী শব্দ-প্রয়োগের নমুনা:

"এ হাওয়ার আগে ছুটতে চায়, অসীম অকালকে পেরিয়ে যাবে বলে পণ করে বসে। অন্য সকল প্রাণী, কারণ উপস্থিত হলে দৌড়য়; এ দৌড়য় বিনা কারণে, যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত সখ। কিছু করতে চায় না, কাউকে মার্‌তে চায় না, পালাতে চায়। পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম্‌ হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পরে না হয়ে যাবে, এই তার মৎলব।" ('ঘোড়া')।

বিদেশী শব্দ প্রয়োগের নমুনা:

"কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না: 'খাজনা দেব কিসে?' শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা করে তার উত্তর আসে, 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান্‌ দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে'।" ('কর্তার ভূত')

একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করার আছে। কি সংস্কৃত, কি দেশী, কি বিদেশী যে শব্দই প্রযুক্ত হোক না কেন, হয়েছে তার প্রয়োগ অপরিহার্য বলে, জোর করে আসেনি, আর চলতি ভাষার চাল কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

রবীন্দ্র-গদ্যধারার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসের ভাষা ও স্টাইল সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা দরকার। ১৯২৮-২৯ এর তর্কপূর্ণ সাহিত্যিক আবহাওয়ায় এই উপন্যাসের জন্ম—'কল্লোল'-গোষ্ঠী ও 'কল্লোল'-বিরোধী-গোষ্ঠীর বাদ প্রতিবাদ থেকে এই উপন্যাস প্রেরণা পেয়েছে, একথা অনস্বীকার্য। রচনার স্টাইল ও ভাষা এই তর্কের অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল। 'শেষের কবিতা'র ভাষা বাংলা গদ্যে কারুশিল্পের চরম নমুনা। সত্তর বছর বয়সে হাওয়া বদলের ঘূর্ণিতে থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ দিলেন। তিনি আধুনিক, প্রগতিশীল ও পরিবর্তনশীল। 'শেষের কবিতা'র ভাষা আমাদের মনকে ধাক্কা দিয়ে সচেতন

করে তোলে। ভাষার মধ্যে ক্রিয়াপদের বিরলতা, কথ্যভাষার ক্রিয়াপদ ও শব্দ নিঃসংকোচে গ্রহণ, বাক্য-বিন্যাসে মাঝে মাঝে ব্যুৎক্রম, এপিগ্রামের ছড়াছড়ি। এই সবের মাধ্যমে চলিত গদ্যকে রবীন্দ্রনাথ দৌড় করালেন, বেঁকিয়ে হেলিয়ে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে—তৎসম থেকে দেশী, তদ্ভব থেকে বিদেশীতে লাফ দিয়ে গদ্য-রাজ্যে রাতারাতি পরিবর্তন এনে দিলেন। 'ঘরে-বাইরে'তে (১৯১৬) যে ভাষা পরীক্ষা শুরু হয়েছিল তার চরম ফল প্রকাশ পেল 'শেষের কবিতা'য় (১৯২৯)। 'শেষের কবিতা'র সংলাপে এমন ঔজ্জ্বল্য ও প্রাখর্য রবীন্দ্রনাথ সঞ্চারিত করেছেন যা আমাদের চোখ ধাঁধিঁয়ে দেয়, মনে হয় নোতুন ভাবে কথা বলার উৎসাহেই কথা বলা হয়েছে। বোধ করি এ জন্যই কোনো প্রখ্যাত সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, 'শেষের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ গল্পের মোড়কে এপিগ্রাম-চানাচুর উপহার দিয়েছেন।'

'শেষের কবিতা'র নায়ক অমিতের কথায় এই তীক্ষ্ণাগ্র সংলাপের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। যোগমায়াকে অমিত বলছে,"আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বউদিদি, আমার হবেন লোকসানের মাসিমা; মায়ের কোলে জন্মেছি। মাসির জন্যে কোনো তপস্যাই করিনি—গাড়ি ভাঙ্গাটাকে সৎকর্ম বলা চলে না, অথচ এক নিমেষে দেবতার বরের মতো মাসি জীবনে অবতীর্ণ হলেন,—এর পিছনে কত যুগের সূচনা আছে ভেবে দেখুন।" এই সাজানো বাক্যবিন্যাসের পেছনে কতটা আন্তরিকতা আছে, আর কতটা চমক লাগানোর প্রয়াস আছে তা বিবেচ্য। তবু 'শেষের কবিতা' এই উজ্জ্বল প্রখর লাস্যময় নৃত্যচঞ্চল ভাষার জন্যই পছন্দ করি, একথা বলা খুব অন্যায় হবে না। অমিত রায়ের কথায় এপিগ্রামের ছড়াছড়ি, সেগুলি তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ সমৃদ্ধ। কয়েকটি উদাহরণ নিন: 'সম্ভবপরের জন্য সব সময়েই প্রস্তুত থাকা সভ্যতা'; 'বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত,' 'সময় যাদের বিস্তর তাদের পাংচুয়াল্ হওয়া শোভা পায়'; 'যে ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ করা আর বাঁধা পশুকে শিকার করা, একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়'; 'নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে'; 'মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া, এ দুই-এ তফাৎ আছে', 'পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না'। এ-তো গেল অমিত রায়ের কথা। কিন্তু লেখকের বর্ণনা, তাতেও এই লক্ষণগুলি প্রকট। শিলং পাহাড়ে বর্ষাগমের বর্ণনা: "তাই ও যখন ভাবছে পালাই পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে শিলেট শিলচরের ভিতর দিয়ে

যেখানে খুশি, এমন সময় আষাঢ় এল পাহাড়ে পাহাড়ে—বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জীর গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘ-দলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে, এইবার ঘনবর্ষণে গিরি নির্ঝরিণীগুলোকে খেপিয়ে কুলছাড়া করবে।" এই বর্ণনার নিম্নরেখ শব্দগুলিতে তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। সাধু স্টাইলকে অস্বীকার করবো বললেই করা যায় না তার প্রমাণ এই বর্ণনা। কিন্তু লক্ষ্য করুন নরেন মিটারের বর্ণনা :

"দীর্ঘকাল য়ুরোপে ছিল। জমিদারের ছেলে, আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যেও ; বিদ্যার্জনের ভাবনাও সেই পরিমাণে লঘু। বিদেশে ব্যয়ের প্রতিই অধিক মনোযোগ করেছিল, অর্থ এবং সময় দুই দিক থেকেই। নিজেকে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দিতে পারলে একই কালে দায়মুক্ত স্বাধীনতা ও অহৈতুক আত্মসম্মান লাভ করা যায়। এইজন্য আর্ট সরস্বতীর অনুসরণে য়ুরোপের অনেক বড়ো বড়ো শহরে বোহেমীয় পাড়ায় সে বাস করেছে। চিত্রকলাকে সে ফলাতে পারে না—কিন্তু দুইহাতে চটকাতে পারে।...তার আয়নার টেবিল প্যারিসীয় বিলাস বৈচিত্র্যে ভারাক্রান্ত।...এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্য সম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।"

বাংলা সাহিত্যে নোতুনের দাবী অমিত তুলেছিল এই কথায় :

"চাই কড়া লাইনের খাড়া রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো, ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুর্যালজিয়ার ব্যথার মতো, খোঁচাওয়ালা কোণওয়ালা, গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়, এমন কি চটকল, পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিল্‌ডিঙ্‌য়ের আদলে নয়, ক্ষতি নেই।"

'শেষের কবিতা'র স্টাইল এই কয়টি উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে। শব্দ প্রয়োগে ও শব্দ গঠনে (যথা—'বন্ধুনি', 'ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা', 'শাড়ীটা গায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গীতে ল্যাপ্টানো', 'বিল্‌ডিঙের আদলে') রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য সংস্কারমুক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

সাম্প্রতিক কালের কথাসাহিত্যে ও প্রবন্ধে যে স্টাইল দেখা যায়, তা বহুল পরিমাণেই 'শেষের কবিতা'র এই স্টাইলের কাছে ঋণী। কিন্তু এই চরম চমকলাগানো ম্যাজিকবিদ্যা দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি, এ আমাদের

পরম সৌভাগ্য। সাধু গদ্যে তিনি আর ফিরে যান নি, কিন্তু বাংলা গদ্যের ভিত্তিভূমি যে তৎসম শব্দ-প্রধান, তা অস্বীকার করেন নি।

বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ দুটি উপন্যাস লেখেন, তার একটি হলো 'মালঞ্চ' (১৯৩৩)। রবীন্দ্রনাথের শেষ তিনটি উপন্যাসে (দুইবোন-মালঞ্চ-চারঅধ্যায় পর্বে) একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে—তা হলো বাক্যের হ্রস্বতা, ক্রিয়াপদ ও কর্তার ব্যুৎক্রম ও সংলাপের অ-সাধারণতা। এর সূচনা 'চতুরঙ্গে', বিকাশ 'শেষের কবিতা'য়, পরিণতি শেষ 'ত্রয়ী' উপন্যাসে। এদের ভাষায় কবি জাদু লাগিয়েছেন। প্রায়শই লিরিক গুণটি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু 'মালঞ্চ' উপন্যাসের পরিণতি যেমন নিষ্ঠুর ভাষাও তেমনি তীক্ষ্ণাগ্র। এর পরিণতিতে যেমন রোমাঞ্চকতার প্রশ্রয় নেই, ভাষাতেও নেই লিরিকের নমনীয়তা। 'মালঞ্চে'র গোড়াকার বর্ণনাটা এই মন্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করে :

"পিঠের দিকে বালিশগুলো উঁচু করা। নীরজা আধশোওয়া পড়ে আছে রোগশয্যায়। পায়ের উপরে সাদা রেশমের চাদরটানা, যেন তৃতীয়ার ফিকে জ্যোৎস্না হালকা মেঘের তলায়। ফ্যাকাসে তার শাঁখের মতো রং, ঢিলে হয়ে পড়েছে চুড়ি, রোগা হাতে নীল শিরার রেখা, ঘনপক্ষ্ম চোখের পল্লবে লেগেছে রোগের কালিমা।"

আরেকটু বর্ণনা নিই :

"বাজল দুপুরে ঘণ্টা। মালীরা গেল চলে। সমস্ত বাগানটা নির্জ্জন। নীরজা দূরের দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে দুরাশার মরীচিকাও আভাস দেয় না। যেখানে ছায়াহীন রৌদ্রে শূন্যতার পরে শূন্যতার অনুবৃত্তি।"

এই স্টাইলে লক্ষ্য করা যায় বাক্যের সংক্ষিপ্ততা, ঋজুতা, ক্রিয়াপদের স্থান-পরিবর্ত্তন। তৎসম শব্দের প্রাচুর্য। প্রাক্-সবুজপত্র পর্বের তৎসম শব্দের প্রাধান্য এখানে কথ্য ভাষার প্রবাহে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

জীবনের শেষ প্রান্তে রবীন্দ্রনাথ দু'টি গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন যা ভাষা বিচারে—স্টাইলের পরিণতি বিচারে উল্লেখযোগ্য। এ দুটি হল : 'ছেলেবেলা' (১৯৪০) ও 'তিন সঙ্গী' (১৯৪০)।

'ছেলেবেলা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ওটি রচনা করেছি বালভাষিত গদ্যে'। এই গদ্যের প্রবহমানতা ও দ্যুতি লক্ষ্য করে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। এই স্মৃতিকথার সূচনায় কবি বলেছেন "আমি জন্ম

নিয়েছিনুম সেকেলে কল্‌কাতায়। শহরে শ্যাক্‌রাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়ছড় করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বেরকরা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর গাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁসফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে, কেউবা পালকি চড়ে, কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা আঁকা, চামড়ার আধঘোমটাওয়ালা, কোচবাক্সে কোচমান বসত মাথার পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারি লজ্জা। রোদ বৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না।”

এখানে রবীন্দ্রনাথ কথ্যভাষাকে স্ল্যাং সমেত সাহিত্যের দরবারে এনেছেন। কথ্যভাষার বাগ্‌ভঙ্গী, তার ক্রিয়াপদ, বিশেষণ, তৈরী-করা যুগ্মশব্দ: সবই এখানে রয়েছে।

'তিন সঙ্গী' গল্পগ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য কেবল গল্প-উপস্থাপনে ও চরিত্রচিত্রণে নয়, ভাষাতেও পরিস্ফুট। এর ভাষায় যে নাটকীয় উপাদান ও সর্বগামিতার লক্ষণ বর্তমান, তাকে চলতি বাংলা গদ্যের চরম ঐশ্বর্যরূপ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। সামান্য উদাহরণেই এ'কথা প্রমাণিত হবে:

'পলাশফুলের রাঙা রঙের মাৎলামিতে তখন বিভোর আকাশ। শালগাছে ধরেছে মঞ্জরী, মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ব্যবসাদাররা মৌ সংগ্রহে লেগে গিয়েছে। ফুলের পাতা থেকে জমা করেছে তসরের রেশমের গুটি। সাঁওতালরা কুড়োচ্ছে পাকা মহুয়া-ফল। ঝিরঝির শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপছিপে নদী, আমি তার নাম দিয়েছিলুম —তনিকা।'

[শেষকথা, তিনসঙ্গী]

'তিন সঙ্গী'র ভাষা এই ছিপ্‌ছিপে নদীর মতো। এটি চলতি বাংলা গদ্যের উচ্ছ্রিত রূপ। পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর রইল এই ভাষায়—এখানে ভাষার নমনীয়তা ও কাঠিন্যের রমণীয় পরিণয় সাধিত হয়েছে।

জীবনের শেষ গদ্যরচনা অশীতিবর্ষ-পূর্তি-উৎসবের অভিভাষণে—'সভ্যতার সংকট'-এ (১৯৪১)—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

“আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা

আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।...ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসন ধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পংকশয্যা দুর্বিষহ নিস্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।"

এখানে দীর্ঘ প্রসারিত বাক্যের পুনরাবির্ভাব ও তৎসম-তদ্ভব শব্দের বহুল প্রয়োগ ঘটেছে। কিন্তু ক্রিয়াপদের প্রয়োগের দ্বারা এর সাবলীল গতিটি বজায় রাখা হয়েছে। এই সমন্বয় সাধনে রবীন্দ্র-গদ্য পূর্ণতা লাভ করেছে।

সাবলীলতা রবীন্দ্র-গদ্যের প্রাণবস্তু। অলংকরণের বা চমকলাগানোর প্রয়াস কখনো এই সাবলীলতাকে ক্ষুণ্ণ করে নি। আঠারো থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত যে দীর্ঘ সাহিত্যজীবন, তা বাংলা গদ্যের ইতিহাসে আপন স্বাক্ষর রেখে গেছে।

'জগৎ-পারাবারের তীরে ছেলেরা করে খেলা'।

এই শিশুদের একটি নিজস্ব জগৎ আছে, সেখানে বিষয়ী লোকের প্রবেশ নিষেধ। বাস্তবের মাপকাঠিতে বিচার সেখানে অচল। সেখানে স্বপ্নকথাই একান্ত বাস্তব। এদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

'ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে,
বণিক ধায় তরণী বেয়ে,
ছেলেরা নুড়ি কুড়ায় পেয়ে সাজায় বসি ঢেলা।
রতন-ধন খোঁজেনা তারা, জানেনা জাল-ফেলা॥

'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যগ্রন্থ দুটিতে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে শিশুদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র চলচ্ছবি এঁকেছেন। বস্তুত মনে হয় এখানে রবীন্দ্রনাথের কবিমন ছাড়া পেয়েছে, সাহিত্যের কঠোর শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে কবি এখানে শিশুদের খেলায় যোগ দিয়েছেন। 'লিপিকা' গ্রন্থের 'গল্প' ও 'রাজপুত্তুর' এই কাহিনী দুটিতে শিশুমনের উপর রূপকথার আশ্চর্য প্রভাবের কথা আলোচনা করেছেন এবং বাস্তবের চেয়ে এই রূপকথার জগতের মূল্য যে অনেক বেশি, তা বলেছেন। সংশয়হীন, অগাধ কৌতূহলপূর্ণ ফ্যাণ্টাসির রাজ্যে ভ্রাম্যমাণ স্বেচ্ছাচারী যে শিশুমন, কবি তাকে সস্নেহে লালন করেছেন। এই পিতৃস্নেহ, এই বাৎসল্য, এই সহানুভূতির পরিচয় এই ছত্রগুলিতে ঃ

ইহাদের করো আশীর্ব্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র এ প্রাণগুলি
নন্দনের এনেছে সংবাদ—
ইহাদের করো আশীর্বাদ।......
কোলে তুলে লও এরে,
এ যেন না কেঁদে ফেরে,
হরষেতে না ঘটে বিষাদ।
বুকের মাঝারে নিয়ে
পারপূর্ণ প্রাণ দিয়ে
ইহাদের করো আশীর্বাদ॥

রবীন্দ্রনাথের এই বাৎসল্যবৃত্তি সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। 'শারদোৎসব', 'ডাকঘর' নাটকে, 'গোরা' উপন্যাসে, 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় এই স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়টিকে সহজেই খুঁজে নিতে পারি।

গল্পগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথের এই বাৎসল্যবৃত্তির অসামান্য প্রকাশ ঘটেছে। বর্তমান প্রবন্ধে সে কথাই আলোচনা করবো। গল্পগুচ্ছের পঁচিশ-ত্রিশটি গল্পের মূল রস বাৎসল্যরস; নায়ক বালক, নায়িকা বালিকা। এই ছোট নায়ক-নায়িকার উপর কবির পিতৃহৃদয়ের স্নেহ অজস্রধারায় বর্ষিত হয়েছে। নায়কেরা সাধারণত চিরচঞ্চল স্নেহবুভুক্ষু কিশোর, অথবা বিবাগী স্নেহ-উদাসীন পলাতক বালক। নায়িকারা যতটা না প্রিয়া তার চেয়ে বেশি কন্যা। মনে হয় গল্পগুচ্ছকার প্রিয়া অপেক্ষা কন্যাকেই তাঁর গল্পে নায়িকারূপে দেখতে চেয়েছেন।

॥ ২ ॥

গল্পগুচ্ছে যেগুলি মূলতঃ প্রেমের গল্প—যেখানে নায়িকার প্রত্যাশাই স্বাভাবিক—সেখানেও রবীন্দ্রনাথ কন্যাকে পেতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 'পোস্টমাষ্টার' গল্পটির নায়িকা রতনের কথা। রতনের যে ছবিটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা একটি স্নেহব্যাকুলা বন্ধনপ্রত্যাশী কিশোরার ছবি। তাকে প্রণয়িনী বলে মনে হয় না। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়, রোগশয্যায়, বান্ধবহীন কর্মক্ষেত্রে পোস্টমাষ্টারের স্নেহব্যাকুল সঙ্গীরূপেই আমরা রতনকে দেখেছি। জ্বরাক্রান্ত পোস্টমাষ্টার যখন সেবাপ্রার্থী হ'ল, তখন "বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল।" রতনের মধ্যে পোস্টমাস্টার স্নেহময়ী জননী ও দিদিকে পেয়েছিল। পোস্টমাস্টার যখন কর্মত্যাগ করে শহরে ফিরে যাচ্ছেন, তখন নৌকায় উঠে "হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।" লেখক তখন 'জগতের ক্রোড়বিচ্যুত অনাথিনী'র প্রতি তাঁর পিতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ বর্ষণ করেছেন।

'সমাপ্তি' গল্পেও ঠিক তাই হয়েছে। নায়িকা মৃন্ময়ীর কিশোরী থেকে যুবতীতে পরিণত হবার আশ্চর্য কাহিনী বা একদা-প্রত্যাখ্যাত স্বামীর জন্য তার ব্যাকুল উন্মুখতা গল্পে প্রাধান্য লাভ করে নি, প্রাধান্য লাভ করেছে তার দুরন্ত দামাল রূপটি। গল্পশেষে যে আনন্দময় সমাপ্তি, তা পাঠকের উপরি-পাওনা। মৃন্ময়ীর বর্ণনায় লেখকের পিতৃহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। "পুরুষ গ্রামবাসীরা স্নেহভরে ইহাকে পাগলী বলে। কিন্তু গ্রামের গৃহিণীরা ইহার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে সর্ব্বদা ভীত চিন্তিত শংকান্বিত।...বাপের আদরের মেয়ে কিনা, সেই জন্য ইহার এতটা দুর্দান্ত প্রতাপ।" কেবল ঈশানবাবুর নহে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 'সমাপ্তি' গল্পের সৃষ্টিকর্তারও আদরের মেয়ে মৃন্ময়ী। লেখকের সস্নেহ প্রশ্রয়ের জোরেই এই বন্ধনহীন বালিকাটি এতো প্রাধান্য পেয়েছে। মৃন্ময়ীর রূপবর্ণনাতেই লেখকের এই সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুরটি ধরা পড়ে: "মৃন্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ; ছোটো কোঁকড়া চুল পিঠ পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়। না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। শরীর দীর্ঘ, পরিপুষ্ট, সুস্থ, সবল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প, সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না।" এ বর্ণনা আর যাই হোক, যে মেয়ে স্বামীবিরহিনী প্রণয়িনী হবে, তার বর্ণনা নয়। কবি এখানেই ক্ষান্ত নন, মৃন্ময়ীর রূপবর্ণনা আরো করেছেন—সে বর্ণনা লোভী যৌবনের আয়োজন নয়, কৈশোরের প্রতিমা-নির্মাণ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "এই বালিকার মুখে চোখে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্যমৃগের মতো সর্বদা দেখা যায়, খেলা করে; সেই জন্য এই জীবনচঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।" একেবারে পাঠকহৃদয়ে পাকাপোক্ত স্থান অধিকার করে। মৃন্ময়ীর মধ্যে নায়িকাকে না খুঁজে সরলা অরণ্যমৃগীকে খোঁজাই উচিত।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে লেখক আর এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন। এখানে প্রণয়কথা নেই, আছে গিরিবালা ও তার শশিদাদার কথা। যুবক শশি-ভূষণ (একটি সদ্যবিকশিত এম-এ, বি-এল) কিশোরী গিরিবালার প্রতিবেশী মাত্র। এই দুই অসমবয়স্ক বন্ধু দুটি "ভাবের আলোচনা ও সাহিত্যচর্চা" করতো। গিরিবালার বর্ণনাটা এই ধরণের: "শশিভূষণ অনেক বড়ো বড়ো কাব্য তর্জমা করিয়া শুনাইত এবং তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিত। বালিকা

কি বুঝিত তাহা অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু তাহার ভালো লাগিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বোঝা না-বোঝায় মিশাইয়া আপন বাল্যহৃদয়ে নানা অপরূপ কল্পনাচিত্র আঁকিয়া লইত। নীরবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মন দিয়া শুনিত, মাঝে মাঝে এক-একটা অত্যন্ত অসংগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং কখনো কখনো একটা অসংলগ্ন প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হইত। শশিভূষণ তাহাতে কখনো কিছু বাধা দিত না—বড়ো বড়ো কাব্য সম্বন্ধে এই অতিক্ষুদ্র সমালোচকের নিন্দা প্রশংসা টীকা ভাষ্য শুনিয়া সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিত। সমস্ত পল্লীর মধ্যে গিরিবালাই তাহার একমাত্র সমজদার বন্ধু।" এইভাবে সাহিত্যচর্চা ও পাকা জাম খাওয়ার অবকাশে দুজনের মধ্যে ভাই-বোনের একটি স্নেহসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। লেখক এই সম্পর্কের উপরেই জোর দিয়েছেন এবং সংসারের নিষ্ঠুর আঘাতে এই সম্পর্ক ও এই আনন্দময় গৃহকোণের খেলা কি ভাবে ভেঙে গেল, তা দেখিয়েছেন। অভিমানিনী কিশোরীর বকুলফুল ও পাকা জামের উপঢৌকন দিয়ে শশিদাদার সঙ্গে ভাব করতে আসার যে মনোরম চিত্রটি লেখক এঁকেছেন, তাই আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে, পরবর্তী ঘটনাগুলি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে নি। লেখকের বলার ভঙ্গিতেই ধরা পড়ে, তাঁর ঔৎসুক্য শশিভূষণের মামলা-মোকদ্দমায় হারজিতে নয়, গিরিবালার সঙ্গে ছদ্ম স্নেহ-কলহে জয়পরাজয়ে। গিরিবালার প্রতি লেখকের বাৎসল্যরস ক্ষরিত হয়েছে প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনায় "যে বৃদ্ধ বিরাট অদৃষ্ট অবিচলিত গম্ভীরমুখে অনন্তকাল ধরিয়া যুগের সহিত যুগান্তর গাঁথিয়া তুলিতেছে সেই বৃদ্ধই বালিকার এই সকাল-বিকালের তুচ্ছ হাসিকান্নার মধ্যে জীবনব্যাপী সুখদুঃখের বীজ অংকুরিত করিয়া তুলিতেছিল।"

আর দুটি গল্পে রবীন্দ্রনাথের বাৎসল্য ক্ষরিত হয়েছে দুটি বোবা বালিকার প্রতি। একজন, 'সুভা' গল্পের সুভা ; অপরজন 'শুভদৃষ্টি' গল্পের অবোধ কিশোরী। নিষ্ঠুর সংসার যখন এই বোবা মেয়ে দুটিকে পীড়ন করেছে, নিষ্ঠুরতম দণ্ড বিধান করেছে, তখন লেখক তাঁর পিতৃহৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ দিয়ে এদের রক্ষা করতে চেয়েছেন। গল্প দুটির বর্ণনাতেই এই স্নেহব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সুভার কী আশ্চর্য বর্ণনা লেখক দিয়েছেন :

"সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো

ঢুটি কালো চোখ ছিল—এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাস মাত্রে কচি কিশলয়ের মত কাঁপিয়া উঠিত। ...কালো চোখকে কিছু তর্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে, ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত, কখনো মুদ্রিত হয়; কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখনো ম্লানভাবে নিবিয়া আসে; কখনো অস্তমান চন্দ্রের মতো অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিগ্‌বিদিকে ঠিকরিয়া ওঠে। মুখের ভাব বৈ আজকাল যাহার অন্য ভাষা নাই তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর—অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি। এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত। তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সংগীহীন।”

এই সংগীহীন বোবা বালিকা যে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, তার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন এই ভাবে:

“প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর—সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা আন্দোলন কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায় বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই শব্দ এবং বিচিত্র গতি ইহাও বোবার ভাষা—বড়ো বড়ো চক্ষু পল্লববিশিষ্ট সুগভীর যে ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লিরব-পূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভংগী, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।...রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত—একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে, আর একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।”

এই বর্ণনায় যে সহৃদয়তা, যে করুণা, যে সুগভীর স্নেহের পরিচয় পাই, তাহা পিতৃহৃদয়ের। সংসারের সমস্ত বঞ্চনার ক্ষতিপূরণ হিসেবে লেখক তাঁর পিতৃহৃদয়ের সকল স্নেহ এই বোবা মেয়েটির প্রতি উজাড় করে দিয়েছেন।

‘শুভদৃষ্টি’ গল্পের সেই বোবা মেয়েটি—হাঁস ও খরগোস কোলে আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে, তার সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের এই সুগভীর স্নেহের

পরিচয় পাই। এই মেয়েটিকেও কবি নিস্তব্ধ গ্রামপ্রকৃতির পটভূমিকায় অংকিত করেছেন। এই সরলা বোবা মেয়েটির বর্ণনা লেখক এক কথায় দিয়েছেন এইভাবে: "সে যে যৌবনে পা ফেলিয়াছে এখনও নিজের কাছে সে খবরটি তাহার পোঁছে নাই।" বোটবিহারী তরুণ জমিদার কান্তিচন্দ্র তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এ দুই ক্ষেত্রে লেখক যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে এ মেয়েকে নায়িকা বলতে ইচ্ছা করে না, লেখকের পিতৃহৃদয়ের তলদেশ থেকে উত্থিত প্রতিমা বলে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে। তার প্রমাণ এই বর্ণনা: "সেদিন শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদীতীরের বিকশিত কাশবনটি ঝলমল করিতেছিল, তাহারই মধ্যে সেই সরল নবীন মুখখানি কান্তিচন্দ্রের মুগ্ধ চক্ষে আশ্বিনের আসন্ন আগমনীর একটি আনন্দচ্ছবি আঁকিয়া দিল। মন্দাকিনী-তীরে তরুণ পার্বতী কখনও কখনও এমন হংসশিশু বক্ষে লইয়া আসিতেন, কালিদাস সে কথা লিখিতে ভুলিয়াছেন।" এ বর্ণনা গভীর পিতৃস্নেহের—বাৎসল্যের পরিচায়ক। বিশেষতঃ শেষ বাক্যটিতে রবীন্দ্রনাথ এই সরলা বোবা বালিকাটিকে মহাকাব্যের নায়িকার মর্যাদা দিয়েছেন।

আরো কয়েকটি মেয়ের ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন। প্রভা ('সম্পাদক'), উমা ('খাতা'), মিনি ('কাবুলিওয়ালা'), হৈমন্তী ('হৈমন্তী'), কুসুম ('ঠাকুরদা'): এদের ভূমিকা কোথাও বা স্ত্রীর, কোথাও বা কন্যার।

কিন্তু মূলত তারা লেখকের পিতৃস্নেহে লালিত-পালিত হয়েছে, বিশেষ বেড়ে ওঠে নি।

'কাবুলিওয়ালা' গল্পে লেখকের পিতৃহৃদয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—এখানে তিনি নিজেকে উন্মুক্ত করেছেন। মিনির বিবাহোদ্যোগের বর্ণনা: "আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ!"

জেলফেরৎ রহমৎ কাবুলির পিতৃস্নেহ ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর পিতৃস্নেহ—এ দু'য়ে কোন পার্থক্য নেই, এটা সেদিন মিনির পিতা বুঝতে পারলেন। "তাহার পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল।"

'হৈমন্তী' গল্পের নায়িকা হৈমন্তীর বর্ণনাতেও এই উপমাটি ব্যবহৃত হয়েছে। "এই গিরিনন্দিনী সতেরো বৎসরকাল অন্তরে বাহিরে কতো বড়ো একটা মুক্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে। কী নির্মল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ঋজু শুভ্র ও সবল হইয়া উঠিয়াছে।" এখানেও লেখকের পিতৃহৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ শ্বশুর-বাড়ীতে নির্যাতিতা এই বালিকাটিকে রক্ষা করতে চেয়েছে।

॥ ৩ ॥

গল্পগুচ্ছের নায়িকা-চরিত্রে যেমন কন্যার ভাবটি প্রবল, নায়ক-চরিত্রে তেমনি অগাধ পিতৃস্নেহধারা-স্নাত কিশোরের ভাবটি প্রবল। এই চরিত্রগুলি অংকন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের পিতৃহৃদয় শিল্পীর উপরে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই নায়কেরা সাধারণত চিরচঞ্চল স্নেহবুভুক্ষু কিশোর অথবা চির-পলাতক উদাসীন প্রকৃতিসন্তান।

স্নেহবুভুক্ষু বালক ও কিশোরদের পরিচয় বহু গল্পেই আছে। যেমনঃ বৈদ্যনাথের দুই ছেলে ('স্বর্ণমৃগ'), গোকুল ওরফে নিতাই পাল ('সম্পত্তি-সমর্পণ'), আশু ('গিন্নি'), সুশীলচন্দ্র ('ইচ্ছাপূরণ'), কালীপদ ('রাসমণির ছেলে'), রসিক ('পণরক্ষা'), নীলকান্ত ('আপদ'), চুণিলাল ('চিত্রকর'), হরিদাস ('হালদার-গোষ্ঠী'), সুবোধ ('ভাইফোঁটা'), নীলমণি ('দিদি')। শৈশবের নানা বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষায় দুঃখবেদনায় মথিত এই চরিত্রগুলি আমাদের কাছে অম্লানরূপে বিরাজ করছে। কেউ বা পাঠশালা-পলাতক, কেউ বা পুতুল-নৌকা পেয়ে খুশী, কেউ বা বাইসাইকেল-অন্তপ্রাণ, কেউ বা ভগিনী-অন্তপ্রাণ, কেউ বা দুর্বল নিরাহ ক্ষীণজীবি, কেউ বা দুর্দান্ত অস্থির চঞ্চল। রবীন্দ্রনাথ সকলকেই তাঁর পিতৃহৃদয়ের স্নেহরসে সঞ্জীবিত করেছেন। আর 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের সেই ক্ষুদ্র চঞ্চল শিশুটি যে দুরন্ত পদ্মায় মাছ ধরতে চায় তাকে আমরা ভুলতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় চরিত্র হচ্ছে চিরপলাতক স্নেহউদাসীন প্রকৃতিসন্তান। এই চরিত্র বারেবারেই দেখা দিয়েছে। কেবল গল্পগুচ্ছে নয়, অন্যত্রও এর দেখা পাই। 'ডাকঘর' নাটকের অমল এই শ্রেণীর চরিত্র। গল্পগুচ্ছে এই

শ্রেণীর কিশোর আছে তিনটি: ফটিক ('ছুটি'), তারাপদ ('অতিথি') ও বলাই ('বলাই')।

'ছুটি' গল্পের নায়ক ফটিক গ্রামের বালকদের সর্দার ছিল। লেখক সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুরে তার বিবিধ দৌরাত্ম্যের বর্ণনা দিয়েছেন। এই বালকটির সংগে গ্রামপ্রকৃতির একটি আশ্চর্য সংগতি স্থাপিত হয়েছিল। কলকাতায় মামার বাসায় এসে ফটিক যে মুহূর্তে বুঝতে পারল সেখানে সে অবাঞ্ছিত, সেই মুহূর্তে সে তার গ্রামে ফিরে যেতে ব্যগ্র হ'ল। এই ব্যগ্রতা ও ব্যাকুলতা কেবল নিজের মায়ের জন্য নয়, গ্রামপ্রকৃতির জন্যও বটে। তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলের মনোভাবটি লেখক আশ্চর্য সহানুভূতি ও সূক্ষ্ম রস-দৃষ্টির সাহায্যে ধরেছেন। সেই সময়কার মনোভাবটির—স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা ও স্নেহের বিনিময়ে আত্মবিক্রয়ের ব্যাকুলতা—রবীন্দ্রনাথ ধরেছেন ও তার অভাবেই ফটিকের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, একথা বলেছেন। পিতৃহৃদয়ের গভীর দরদ ছাড়া এ মনোভাবটি ধরা অসম্ভব। স্নেহহীন মামার বাসায় ফটিকের বেদনার কী আশ্চর্য বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, মনে হয় লেখক যেন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এটি বর্ণনা করেছেন। "প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্য-ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেইসব দল-বল উপদ্রব স্বাধীনতা, এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত। জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা —কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত আকুলতা, গোধূলি সময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন—সেই লজ্জিত শংকিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।"

এই বর্ণনার পিছনে যে আবেগ ও দরদ প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তা সহজেই অনুভববেদ্য। ফটিকের মৃত্যু বর্ণনার সংযত ভাষা লেখকের পিতৃহৃদয়ের স্নেহের পরিচায়ক—"যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।"

'অতিথি' গল্পের তারাপদ প্রকৃতির স্নেহে লালিত। তার মধ্যে সমস্ত

গ্রামপ্রকৃতি ধরা দিয়েছে। এই ঘরছাড়া স্নেহউদাসীন বালকটির বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ পিতৃহৃদয়ের সকল অনুরাগ ও স্নেহ ঢেলে দিয়েছেন। তারাপদের বড়ো বড়ো চোখ এবং হাস্যময় ওষ্ঠাধরে একটি সুললিত সৌকুমার্য প্রকাশ পেয়েছে। লেখক তারাপদকে 'তাপসবালক' আখ্যা দিয়েছেন। সংসারের ও গ্রামের সকল আদর, প্রলোভন ও প্রশ্রয়কে উপেক্ষা করে সে ঘরছাড়া হয়ে গেল। তার সম্পর্কে লেখক বলেছেন: "স্নেহবন্ধনও তাহার সহিল না; তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে। সে যখনই দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বত্থগাছের তলে কোন্ দূরদেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, অথবা বেদেরা নদীর তীরের পতিত মাঠে ছোটো ছোটো চাটাই বাঁধিয়া বাঁখারি ছুলিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত।" কোনো নিয়মের বাঁধনে সে ধরা দেয় নি। "সে এই সংসারে পংকিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজ-হংসের মতো সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কৌতূহলবশত যতবারই ডুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না। এইজন্য এই গৃহত্যাগী ছেলেটির মুখে একটি শুভ্র স্বাভাবিক তারুণ্য অম্লানভাবে প্রকাশ পাইত।" একবার যাত্রার দলে, একবার জিম্‌ন্যাষ্টিকের দলে, একবার নৌকারোহী দোকানীর সঙ্গে, আবার কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবুর সঙ্গে তারাপদ ঘুরে বেড়ায়। সকল ব্যাপারেই তার পটুত্ব আছে, কোনো ব্যাপারেই তার আগ্রহের অভাব নেই, অথচ কিছুতেই তার আসক্তি নেই।

প্রকৃতির সঙ্গে তারাপদর ঘনিষ্টতা যে কতটা সুনিবিড়, তা এই গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। এই ঘনিষ্ঠতার বর্ণনায় সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুর লক্ষ্য করা যায়: "তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্বদাই সচল হইয়া আছে; এইজন্য সে এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মতোই নিশ্চিন্ত উদাসীন, অথচ সর্বদাই ক্রিয়াসক্ত। মানুষ মাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে; কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গে ভূত-ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই—সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য।"

ঘরছাড়া, পালিয়ে বেড়ানো, অকাজের রাজা, উদাসীন এই বালকটিকে লেখক তিরস্কার করেন নি, এর প্রতি স্নেহ বর্ষণ করেছেন। জমিদার মতিলাল

বাবু বা নিজের আত্মীয় বন্ধু—কারুর স্নেহের দাম তারাপদ দিল না, পুনর্বার সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তাই নিরুদ্দেশের বর্ণনাটি কী মমতাপূর্ণ: "স্নেহ-প্রেম বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।" 'অতিথি' গল্প পড়লে এই কথাই মনে হয়, তারাপদর প্রতি রবীন্দ্রনাথের অবারিত সহানুভূতি ও প্রশ্রয় ছিল।

আরেকটি গল্পের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটাতে চাই। সে গল্পের নাম 'বলাই'। এটি ঠিক গল্প নয়, আসলে একটি কবিতামাত্র। সে কবিতা রবীন্দ্রনাথের শৈশবজীবন স্মৃতির কবিতা। 'ছেলেবেলা' ও 'জীবনস্মৃতি'তে যে বন্দী কিশোর রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা আছে, এ যেন তারই প্রতিরূপ। 'সোনার-তরী', 'বনবাণী' কাব্যে বৃক্ষ-প্রকৃতির প্রতি কবির যে গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে, এই গল্প তারই গদ্যরূপ। মাতৃহীন এই কিশোর (বলাই) সংসারের সন্তান নয়, প্রকৃতির সন্তান। তার প্রকৃতিতে গাছপালার মূল সুরগুলোই প্রবল হয়ে উঠেছে। ঘাসের মাঝে নামহারা হল্‌দে ফুল, কণ্টিকারী গাছের নীলফুল, শিমুল গাছ: সবের প্রতিই বলাইয়ের অসাধারণ অনুরাগ। সারা গল্প এই অনুরাগের গুঞ্জনে মুখর আর এ অনুরাগের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ সমর্থন ও প্রশ্রয়—এই হ'ল 'বলাই' গল্প।

সাংসারিক অর্থে নিষ্কর্মা, ফাঁকিবাজ, উদাসীন ফটিক, তারাপদ, বলাইয়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথ গুরুগিরি করেন নি, তাদের সমর্থন করেছেন ও প্রশ্রয় দিয়েছেন। পিতৃহৃদয়ের অজস্র বাৎসল্যরসধারায় এই সব কিশোর কিশোরীরা স্নাত হয়েছে।

গল্পগুচ্ছের পটভূমি

বন্ধুবর লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ একবার সাহিত্যের সার্থকতা আলোচনাপ্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না, আমরা জ্ঞানতঃ কিংবা অজ্ঞানতঃ মানুষকেই সব চেয়ে বেশি গৌরব দিয়ে থাকি? আমরা যদি কোনো সাহিত্যে অনেকগুলো ভ্রান্ত মতের সঙ্গে একটা জীবন্ত মানুষ পাই সেটাকে কি চিরস্থায়ী করে রেখে দিই নে? জ্ঞান পুরাতন এবং অনাদৃত হয়, কিন্তু মানুষ চিরকাল সঙ্গদান করতে পারে। সত্যকার মানুষ প্রতিদিন যাচ্ছে এবং আসছে; তাকে আমরা খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখি, এবং ভুলে যাই, এবং হারাই। অথচ মানুষকে আয়ত্ত করবার জন্যেই আমাদের জীবনের সর্বপ্রধান ব্যাকুলতা। সাহিত্যে সেই চঞ্চল মানুষ আপনাকে বদ্ধ করে রেখে দেয়; তার সঙ্গে আপনার নিগূঢ় যোগ চিরকাল অনুভব করতে পারি। জীবনের অভাব সাহিত্যে পূরণ করে। চিরমনুষ্যের সঙ্গ লাভ করে আমাদের পূর্ণ মনুষ্যত্ব অকলঙ্কিত ভাবে গঠিত হয়—আমরা সহজে চিন্তা করতে, ভালবাসতে এবং কাজ করতে শিখি। সাহিত্যের এই ফলগুলি তেমন প্রত্যক্ষগোচর নয় বলে অনেকে একে শিক্ষার বিষয়ের মধ্যে নিকৃষ্ট আসন দিয়ে থাকেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সাধারণতঃ দেখলে বিজ্ঞান-দর্শন ব্যতীতও কেবল সাহিত্যে একজন মানুষ তৈরি হতে পারে। কিন্তু সাহিত্য-ব্যতিরেকে কেবল বিজ্ঞান-দর্শনে মানুষ গঠিত হতে পারে না।" [আলোচনা, 'সাহিত্য']

বন্ধুবরকে আর-একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "যতই আলোচনা করছি ততই অধিক অনুভব করছি যে, সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ। তাই তুমি যদি একটা টুকরো সাহিত্য তুলে নিয়ে বল 'এর মধ্যে সমস্ত মানুষ কোথা' তবে আমি নিরুত্তর। কিন্তু সাহিত্যের অধিকার যতদূর আছে সবটা যদি আলোচনা করে দেখ তা হলে আমার সঙ্গে তোমার কোনো অনৈক্য হবে না। মানুষের প্রবাহ হু হু করে চলে যাচ্ছে; তার সমস্ত সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর-কোথাও থাকছে না—কেবল সাহিত্যে থাকছে। সংগীতে চিত্রে বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই।

এইজন্যই সাহিত্যের এত আদর। এইজন্যই সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার।" [সাহিত্যের প্রাণ, 'সাহিত্য']

এই দুই পত্রের তারিখ যথাক্রমে ফাল্গুন ১২৯৮ ও আষাঢ় ১২৯৯ বঙ্গাব্দ। গল্পগুচ্ছের প্রথম খণ্ডের প্রথম দুটি গল্পের ['ঘাটের কথা' ও 'রাজ পথের কথা'] রচনাকাল ১২৯১ বঙ্গাব্দ। পরবর্তী তেইশটি গল্পের ['দেনাপাওনা' থেকে 'দানপ্রতিদান'] রচনাকাল ১২৯৮-৯৯ বঙ্গাব্দ। সবটা মিলিয়ে দেখলে বলা যায়, মানবসঙ্গব্যাকুলতাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের মৌল প্রেরণা এবং গল্পগুচ্ছের প্রেরণাউৎস।

'মানুষকে আয়ত্ত করবার জন্যেই আমাদের জীবনের সর্বপ্রধান ব্যাকুলতা' আর এই ব্যাকুলতাই গল্পগুচ্ছের পটভূমি। 'চির মনুষ্যের সঙ্গ লাভে'র গভীর আন্তরিক ব্যাকুলতা গল্পগুলিকে অভিষিক্ত করেছে। মানবপ্রবাহের মধ্যে যে চিরন্তনতা ও নবীনতা আছে, তা রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছে অনুভব করেছেন। আসল কথা এই গল্পগুচ্ছের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ নিত্যপ্রবহমান মানবজীবনকেই প্রত্যক্ষ করেছেন ও বাণীরূপ দিয়েছেন। গল্পগুচ্ছে মানবজীবনের খণ্ড রূপ নয়, অখণ্ড রূপটাই প্রধান। লেখক যখন 'আপনার জন্মভূমির পরিচয় দিতে থাকে, আপন মানবাকার গোপন করে না। নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা এবং জীবনের আন্দোলন প্রকাশ করে, এবং মানবজীবনের সঙ্গে সাহিত্যকর্মকে মিলিয়ে নিতে চায়, তখনই লেখক সার্থকতা অর্জন করে।' রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস গল্পগুচ্ছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

গল্পগুচ্ছের পটভূমি তাই নিত্যপ্রবহমান মানবজীবনের পটভূমি। আর সেই সঙ্গে তা বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিকায় প্রসারিত। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে চিরন্তনতা, বৈচিত্র্য, নিত্যপরিবর্তনশীলতা ও নিত্যনবীনতা বর্তমান, তা গল্পগুচ্ছেও বর্তমান। প্রকৃতি যে চিরপুরাতন ও চিরনবীন, তার পরিচয় পাই ঋতুতে ঋতুতে। একইভাবে আষাঢ়ের নবীন মেঘ চেনা পৃথিবীর 'পরে অচেনার আভাস নিক্ষেপ করে, একইভাবে শিউলির সুবাস হেমন্তের দূতরূপে আসে। সেই একইভাবে ফাল্গুনের মাতাল হাওয়া মনকে ব্যাকুল করে, চৈত্রে ঝরাপাতার দল বসন্তকে অভ্যর্থনা করে। এই লীলা প্রতি বৎসরের ও চিরকালের। প্রকৃতির জীবনের এই আদিমতা ও নবীনতাকে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনেও পেতে চেয়েছেন, পেয়েছেন। তার পরিচয়স্থল গল্পগুচ্ছ। গল্পের পটভূমিতে প্রকৃতি বর্তমান, তা গল্পের ফ্রেম নয়, গল্পের মধ্যেই তা অনুস্যূত হয়ে আছে। একে বাদ দিয়ে, ঋতুকে বিচ্ছিন্ন করে রবীন্দ্রনাথের গল্পকে সত্যরূপে পাই না। একটি

মাত্র উদাহরণ গ্রহণ করা যাক। 'সমাপ্তি' গল্পের কিশোরী নায়িকা মৃণ্ময়ী যৌবনবতী রমণীতে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে: এই জীবনসত্যকে রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব কৌশলে প্রকৃতি বর্ণনার মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন। প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা মৃণ্ময়ী একদা-প্রত্যাখ্যাত দয়িতের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এসেছে। সংসারের সঙ্গে মৃণ্ময়ীর মিলনের একটি আশ্চর্যসুন্দর উপমা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, বলেছেন: 'তরুর সহিত শাখাপ্রশাখার যেরূপ মিল' মৃণ্ময়ীকে সেরূপ মিলনের মাধ্যমে সংসার আপন করে নিল। আশ্চর্যতর বর্ণনা পাই তারপর—মৃণ্ময়ীর বাল্য অংশ যৌবন থেকে বিচ্যুত হল, অপূর্ব বেদনা ও বিস্ময়ে এই যৌবনবতী স্বামীসঙ্গের জন্য ব্যাকুল হলো।

গল্পবিধাতা রবীন্দ্রনাথ মৃন্ময়ীর জীবনে এই গুরুতর পরিবর্তনের বর্ণনা দিয়েছেন প্রকৃতি-বর্ণনার মাধ্যমে; বলেছেন: "এই-যে একটি গভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া উঠিল, ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম আষাঢ়ের শ্যামসজল নবমেঘের মতো তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চোখের ছায়াময় সুদীর্ঘ পল্লবের উপর আর একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিল।"

গল্পগুচ্ছে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। রতন, তারাপদ, ফটিক, সুভা, গিরিবালা, খোকাবাবু—এরা সবাই গ্রামপ্রকৃতি তথা বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গীভূত। প্রকৃতির পটভূমি থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায় না। গল্পগুচ্ছে বর্ষাঋতুর আধিপত্য (রবীন্দ্রসংগীতেও তা-ই)। কেবল ঘটনা নয়, কথা নয়, সেইসঙ্গে প্রকৃতিও গল্পগুচ্ছের অপরিহার্য অঙ্গ। বোধ হয়, এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, প্রাক্-সবুজপত্র-পর্বে রচিত সকল গল্পে প্রকৃতি প্রধান চরিত্র। এই প্রধান চরিত্রের আশ্রয়ে ছোট ছোট মানব-চরিত্র বেড়ে উঠেছে, পরিণতি লাভ করেছে।

শুধু তাই নয়, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে নিত্যতা আছে, গল্পগুচ্ছেও তা বর্তমান। কথাটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। বিশ্বপ্রকৃতির চিরনবীনতার রহস্যটি কি? বসন্ত সারা বৎসরে থাকে না, নির্দিষ্ট সময়সীমার পথ অতিক্রম করে সে বারবার ফিরে আসে। চৈত্রের বিবর্ণ হলুদ ঝরাপাতা প্রতিবারই বিদায়ের গান গায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, চলে যায়, আবার ফাল্গুনের উন্মনা বাতাসে বসন্ত নবরূপে ফিরে আসে। নিত্যতার মধ্যেই তাই প্রবাহমানতা

চলে-যাওয়া ও ফিরে-আসা রয়েছে। জীবনের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ এই নির্মম সত্যটিকে দেখতে চেয়েছেন। ক্ষুদ্র সংকীর্ণ মানবজীবনকে বৃহৎ ব্যাপ্ত বিশ্বজীবনের পটভূমিতে স্থাপনা করেছেন, মরণের কালো পর্দাখানা জীবনের পটভূমিতে নিত্য বর্তমান, তারি উপর দিয়ে জীবনের কৌতুকনাট্য নেচে চলেছে অন্তিম অঙ্কের দিকে ; তাই জীবনে মৃত্যু অনিবার্য, গল্পে মৃত্যুর পদক্ষেপ অপ্রতিরোধ্য। গল্পগুচ্ছে সেজন্যে দেখি মৃত্যু বার বার হানা দিয়েছে, কিন্তু তাতে বৃহৎ উদাসীন বিশ্বপ্রকৃতি নির্বিকার থেকেছে, ভ্রূক্ষেপ না করে চলে গিয়েছে। মরণের পর্দাখানা গল্পগুচ্ছে ভয়ংকর নয়, কালো নয়, নিশ্চল নয়, সেটি রঙিন ও গতিশীল। গোড়ার দিকের গল্প (গল্পগুচ্ছের প্রথম পর্ব) যখন লেখা হয়েছে, সে-সময়ের অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'রুদ্ধগৃহ' ও 'পথপ্রান্তে' [প্রথম প্রকাশ—১২৯২ বঙ্গাব্দ, 'বালক' পত্রিকা। 'বিচিত্র প্রবন্ধে' সঙ্কলিত]। শোকের আঘাতে জীবন সত্যদৃষ্টি লাভের পরিচয় ঐ দুটি রচনায় আছে। স্মরণের আবরণে মরণকে ঢেকে রাখা যায়, কিন্তু জীবনকে কে বেঁধে রাখতে পারে ? তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে, নব নব পূর্বাচলে। 'বলাকা'র 'শাজাহান' কবিতার এই সত্য ১২৯২ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। ঐ দুটি রচনা এবং গল্পগুচ্ছ তার পরিচয়স্থল। বস্তুতঃ এই সত্যানুভূতি গল্পগুলিতে একটি অসাধারণ মাহাত্ম্য অর্পণ করেছে।

বিশ্বপ্রকৃতির উদাসীন বৃহৎ পটভূমিতে মানবজীবনের ছোট দুঃখশোকের কোনো মূল্য নেই, সত্য হ'ল জীবনের চিরন্তন প্রবাহ। বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিতে মানবজীবনের তুচ্ছ ঘটনাবিক্ষোভের অকিঞ্চিৎকরতাকে রবীন্দ্রনাথ বারে বারেই স্পষ্ট করে তুলেছেন।

গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্প 'ঘাটের কথা'। এখানেই এই বৃহৎ সত্যের ইশারা পাই। ঘাটের মুখে আমরা শুনি, "আমার দিনের আলো রাত্রের ছায়া প্রতিদিন গঙ্গার উপরে পড়ে, আবার প্রতিদিন গঙ্গার উপর হইতে মুছিয়া যায়—কোথাও তাহাদের ছবি রাখিয়া যায় না। সেইজন্য, যদিও আমাকে বৃদ্ধের মতো দেখিতে হইয়াছে, আমার হৃদয় চিরকাল নবীন। বহুবৎসরের স্মৃতির শৈবালভারে আচ্ছন্ন হইয়া আমার সূর্যকিরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাৎ

একটা ছিন্ন শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে। আবার স্রোতে ভাসিয়া যায়।”

জীবনে এটাই সত্য। তাই ঘাট বহু মানবলীলার সাক্ষী, কিন্তু সবই ভেসে যায়, কিছুই থাকে না। সেইজন্য বালবিধবা কুসুমের অসহ্য হৃদয়বেদনা ও জীবনবিসর্জনের কাহিনী উদাসীনকণ্ঠে ঘাট বর্ণনা করেছে। কুসুম জলে ডুবে মরল। তখন—“চাঁদ অস্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না! অন্ধকারে বাতাস হু হু করিতে লাগিল; পাছে তিলমাত্র কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়। আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না।”

কোথাও কুসুমের চিহ্নমাত্র রহিল না, ছিন্ন শৈবালের মতো স্রোতে ভেসে গেল। এই নির্মম উদাসীন সুর গল্পগুচ্ছে ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

‘পোষ্ট মাষ্টার’ গল্পে এই উদাসীনতার নবরূপ লক্ষ্য করি। মানবহৃদয়ের একটি সাধারণ অথচ গভীর বেদনা এখানে শিল্পরূপ লাভ করেছে। গ্রাম্যবালিকা রতনের স্নেহ-ভালবাসা যেভাবে উপেক্ষিত হ’ল, তাতে আমাদের সমস্ত মন করুণরসে অভিষিক্ত হয়। পোষ্টমাষ্টার কর্মস্থল ত্যাগ করে এবং আপন অজ্ঞাতে একটি বিবশ প্রেমব্যাকুলা হৃদয়ের আবেদনকে পদদলিত করে শহরে ফিরে যাচ্ছেন এবং একবার মনেও হয়েছে যে রতনকে নিয়ে আসি, কিন্তু হায় তা আর হল না!

পোস্টমাস্টার যখন—

“নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল,—বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল। তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটি বেদনা অনুভব করিতে লাগলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপি বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল ফিরিয়া যাই। জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদী প্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কি, পৃথিবীতে কে কাহার।”

এই বিচ্ছেদ সত্য, এই-ই জীবন। 'পৃথিবীতে কে কাহার'—এই নিষ্ঠুর মন্তব্যটি যোগ করে দিতে লেখকের বাধে নি।

'পোষ্ট মাষ্টার' গল্পের প্রায় সমকালে রচিত 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় [রচনাকাল: ১২৯৯ বঙ্গাব্দ] একই নির্মম বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। চার বছরের শিশুকন্যার স্নেহডোর ছিন্ন করে প্রবাসগামী পিতার যাত্রা-আয়োজন —'যেতে দেব না' এই আবেদন ব্যর্থ হয়েছে, চিরকাল হচ্ছেঃ

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সব-চেয়ে পুরাতন কথা, সব-চেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব।' হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হতে।

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে নির্মম বিশ্বপ্রকৃতির আবার দেখা পাই। মানবজীবনের ক্ষণিক ঘটনাবিক্ষোভের প্রতি বিশ্বপ্রকৃতি কত উদাসীন, তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন এইভাবে,—খোকাবাবু

"গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল—একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে গেল—দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বারবার আপনাদের খেলা-ঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, 'বাবু—খোকাবাবু—লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার।'

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না, এবং পৃথিবীর এই-সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।"

উদাসীন পদ্মার ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ নিরাসক্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন। একটি মানবকের মৃত্যু বৃহৎ বিশ্বপ্রকৃতির কাছে কিছুই নয়, এই ভাবটি এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে।

এই অনুভূতি কি আমাদের মনে নোতুন ভাবে উপস্থিত হয় না যখন আমরা 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্প পড়ি? গিরিবালা আর তার শশিদাদার কাহিনী তো বিশ্বপ্রকৃতির নির্বিকার উদাসীনতার কাছে মানবজীবনের বড় বড় ঘটনার ক্ষুদ্রতার ও অকিঞ্চিৎকরতারই কাহিনী। গিরিবালা ও শশিভূষণের বন্ধুত্বকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে' গিরিবালার বিয়ে হলো। শশিভূষণ নদীতীরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু অশ্রুমতী নববধূ গিরিবালা জানতেও পেল না যে তার আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি কাছেই রয়েছেন। নৌকা ছেড়ে দিলো, গ্রাম ছেড়ে অজানা নদীপথে ভেসে চল্‌লো, ক্রমশ দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই দুইটি হৃদয়ের মর্মান্তিক বিচ্ছেদবেদনায় কিন্তু পৃথিবীর কিছুই আসে যায় না। তাই নৌকা যখন চলে গেল, তখন

"জলের উপর প্রভাতের রৌদ্র ঝিক্‌ঝিক্ করিতে লাগিল, নিকটের আম্রশাখায় একটা পাপিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মুহুর্মুহু গান গাহিয়া মনের আবেগ কিছুতেই নিঃশেষ করিতে পারিল না, খেয়া নৌকা লোক বোঝাই লইয়া পারাপার হইতে লাগিল, মেয়েরা ঘাটে জল লইতে আসিয়া উচ্চ কলস্বরে গিরির শ্বশুরালয়-যাত্রার আলোচনা তুলিল, শশিভূষণ চশমা খুলিয়া চোখ মুছিয়া সেই গরাদের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ একবার মনে হইল যেন গিরিবালার কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন! 'শশিদাদা'!—কোথায় রে কোথায়? কোথাও না! সে গৃহে না, সে পথে না, সে গ্রামে না—তাঁহার অশ্রুজলাভিষিক্ত অন্তরের মাঝখানটিতে।"

শেষের এই নিষ্ঠুর মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির নির্মমতা ও উদসীন-তাকেই ভাষা দিয়েছেন।

'শাস্তি' গল্পে অপ্রত্যাশিত আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের দায় যখন সরলা গ্রামবধূ চন্দরার কাঁধে তারই স্বামী চাপিয়ে দিল, তখন সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই চরম প্রতারণা দেখে নিদারুণ অভিমানে চন্দরা ফাঁসিকাঠের দিকে ঝুঁকল, এবং সে স্বীকারোক্তি করল। অগত্যা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিরপরাধ চন্দরাকে সেশনে চালান দিলেন। "ইতিমধ্যে চাষবাস হাট বাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব পূর্ব

বৎসরের মতো নবীন ধান্যক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।"

এই বৃহৎ জগতে চন্দরার বিপৎপাতে কিছুই আসে যায় না, কোনো কাজই বন্ধ হয় না, উদাসীন পৃথিবী একটি মানবীর দুঃখে কিছুমাত্র বিচলিত হলো না।

এই-সব বিপরীত ছবি আমাদের মনের মধ্যে একটা ধাক্কা দেয়, আমরা হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠি, আমাদের দুঃখের অনুভূতি তীব্রতর হয় এবং বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিতে মানবসমাজের ছোটবড়ো ঘটনার অকিঞ্চিৎকরতা নোতুন করে' উপলব্ধি করি। ফলে বৃহৎ বিশ্বপ্রকৃতি ও চিরন্তন বিশ্ব-জীবন-সম্পর্কিত একটি নবতর চেতনায় উদ্বোধিত হই। মনে মনে প্রশ্ন করি, এর কী দরকার ছিলো। তখন ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ বেদনা শোককে বৃহতের পটভূমিতে আমরা স্থাপন করতে বাধ্য হই, এবং এই চিরন্তন অনশ্বর বিশ্বজীবনকে উপলব্ধি করি। ব্যক্তিগত দুঃখ বিশ্বের পটভূমিতে উন্নীত হয়ে নবরূপে দেখা দেয়।

পৃথিবীর বন্দনা রচনা করতে গিয়ে যে-কবি পরবর্তীকালে বলেছিলেন,

জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোটো ছোটো পিঞ্জরে,
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা,
সব কীর্তির অবসান।

সে-কবি গল্পগুচ্ছের এই সব জীবনচিত্রে পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, পৃথিবী মানুষের জীবনকে নিয়ে খেলা করে, শ্রেয়কে করে দুর্মূল্য, কৃপা করে না কৃপাপাত্রকে। এই বিশ্বচেতনা ও তীব্র দুঃখের আলোকে কবি জীবনের সত্যমূল্য পেতে চেয়েছিলেন, জেনেছিলেন জীবনের কোনো-একটি ফলবান্ খণ্ডকে যদি পরম দুঃখে জয় করা যায়, তবে পৃথিবীর স্বীকৃতি পাবেন। দুঃখের এই মহৎ উপলব্ধি বাণীরূপ লাভ করেছে আলোচ্যমান গল্পগুলিতে। গল্পগুচ্ছে ক্ষুদ্র মানবজীবনকে বৃহৎ উদাসীন নির্বিকার বিশ্বজীবনের পটভূমিতে স্থাপনা করে' রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেখানে প্রকৃতি ও মানবজীবন এক সুরে বাঁধা, সেখানে চিরমনুষ্যের সঙ্গলাভের ব্যাকুলতার সুর বেজে উঠেছে। সে সুর আমাদের মুগ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে, নবতর জীবনচেতনায় উদ্বোধিত করে।

আমিয়েলের জর্নাল ও রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রতি ক্ষেত্রে জয়যাত্রার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সে স্বাক্ষর কেবল সচেতন সাহিত্যকর্মে নয়, অর্ধমনস্ক বা অন্যমনস্ক সৃষ্টিতেও রয়েছে। পত্র রচনায় কবি যে অসামান্য শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা-ই যথেষ্ট নয়; এর মধ্যে একটি অসাধারণ মনের অন্তরঙ্গ পরিচয় ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্র-পত্রসাহিত্য নিতান্ত কম নয়। তার মধ্যে যথার্থ পত্র-সাহিত্যের গৌরব দাবী করতে পারে: 'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', 'চিঠিপত্র'। 'পত্রধারা'—উপদেশাবলীর সংকলন মাত্র। আর 'য়ুরোপের চিঠি', 'রাশিয়ার চিঠি', 'জাপানযাত্রী', 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি', 'পথে ও পথের প্রান্তে'—পত্রাকারে ভ্রমণ-সাহিত্য এবং চিন্তাপ্রধান রচনা-সংগ্রহ মাত্র; এগুলিতে সচেতন সজাগ দৃষ্টি, প্রত্যক্ষ সৃষ্টিচেতনা, সতর্ক পোশাকিয়ানা ও নৈর্ব্যক্তিকতা বর্তমান। তাই শেষোক্ত গ্রন্থনিচয় পত্র-সাহিত্যের মূল ধর্ম থেকে বিচ্যুত।

'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ও 'চিঠিপত্র' (ছয় খণ্ড) যথার্থ পত্রসাহিত্য। খাঁটি পত্রে অন্তরঙ্গতা ও নিভৃতি, ঘরোয়া পরিবেশ ও সহজ সুর থাকা একান্তই প্রয়োজন। তা এই তিনটি সংকলনে আছে, বাকিগুলিতে নেই। আর এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'ছিন্নপত্র'। 'চিঠিপত্রে' পারিবারিক রবীন্দ্রনাথকে তাঁর আত্মীয়বন্ধুস্বজনের মধ্যে আমরা চিনে নিতে পারি। কৌতুকে, হাস্যপরিহাসে সাংসারিক আসক্তি ও দুর্বলতার প্রকাশে, সাহিত্য-চিন্তা ও চর্চায়, বুদ্ধির দীপ্তিতে ও স্নেহের জ্যোতিতে এই সঙ্কলনটি উজ্জ্বল হয়ে আছে।

'ছিন্নপত্র' পারিবারিক হয়েও তার বাইরে চলে গেছে, ঘরোয়া হয়েও তা নির্বিশেষ, ব্যক্তিগত হয়েও তা বিশ্বগত। 'ছিন্নপত্রে' প্রবন্ধোচিত গাম্ভীর্য ও সতর্কসচেতনতা নেই—অনায়াস লঘুতা আছে, ব্যক্তিমানুষের পরিচয় আছে, পত্রলেখক ও প্রাপকের মধ্যে একটি সংযোগ ও উত্তাপের স্বাক্ষর আছে। কিন্তু এই-ই সব নয়। এ ছাড়াও কিছু আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্গূঢ় সাহিত্য-জীবনের মহত্তর পরিচয় 'ছিন্নপত্রে' বিধৃত হয়েছে; এখানেই তার গৌরব। এই পত্রগুচ্ছ গদ্যসৌন্দর্যে স্বাদ-বৈচিত্র্যে কবিমানসের অন্তরঙ্গ সত্য পরিচয়-প্রকাশে মূল্যবান। 'ছিন্নপত্রে'র কালপরিধি দশ বৎসর বিস্তৃত—১৮৮৫-

খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই দশ বৎসরে তরুণ যৌবনের বাউল কবির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যফসল অমরতার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছে। এই পর্বে 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি' 'চিত্রাঙ্গদা,' 'মায়ার খেলা', 'গোড়ায় গলদ,' 'রাজা ও রাণী,' 'মন্ত্রী অভিষেক,' 'গল্পগুচ্ছ,' এবং অজস্র প্রবন্ধ ও 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী' রচিত হয়েছে। এ সময়ে কবি 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

'ছিন্নপত্রে' মোট ১৫২টি পত্র আছে। তার মধ্যে প্রথম তেরটি পাঁচ বৎসরের মধ্যে রচিত, বাকিগুলি চার বৎসরে লিখিত। ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা ও বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র মজুমদার পত্রপ্রাপক। উপরে উদ্ধৃত গ্রন্থগুলির সঙ্গে 'ছিন্নপত্রে'র সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। 'গল্পগুচ্ছ' ও 'সোনার তরী'-'চিত্রা'-চৈতালী'র বহু কবিতা-গল্পের উৎস, উপাদান ও পটভূমি 'ছিন্নপত্র'। 'ছিন্নপত্রে' সংসার-অভিজ্ঞ বিষয়ী হাস্যরসিক বরোয়া পরিবারকেন্দ্রিক স্নেহাসক্ত বন্ধুবৎসল রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আছে। এহ বাহ্য। 'ছিন্নপত্রে'র এই বহিরঙ্গ বিবরণে তার মূল্য নির্ভর করে না, কবিমানসের অন্তরঙ্গ প্রকাশেই এর মূল্য।

॥ ২ ॥

ছিন্নপত্রের প্রধান মূল্য এইখানে যে, তা রবীন্দ্রমানসের অন্তরঙ্গ পরিচয়টিকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ব্যাপারে ও শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারে সহজে কিছু বলতে চাইতেন না, এ কথা বিদগ্ধ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। শিল্পসৃষ্টির রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে যে সাজঘর আছে, তার পট সরিয়ে ফেলে মূল উৎস বা উপাদানের পরিচয় দিতে রবীন্দ্রনাথের ছিল একান্ত অনীহা। কাব্যের মধ্যেই কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয়; জীবনচরিতে, বাইরের ঘটনায় কবি-পরিচয়সন্ধান মূঢ়তা—এই ছিল তাঁর অভিমত। কবিজীবনের যেটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব—তরুণ যৌবনের কবির জীবনের পঁচিশ থেকে চল্লিশ বৎসর বয়সের পর্ব—সেটির কথা রবীন্দ্রনাথ বলতে চান নি। 'জীবনস্মৃতি' কবি রচনা করেছেন পঞ্চাশে উপনীত হয়ে, কিন্তু জীবনের প্রথম পঁচিশ বৎসরের কথা বলেই তিনি লেখনীর মুখ চেপে ধরেছেন, যৌবনের সিংহদ্বারে পাঠক-কে পৌঁছে দিয়ে সরে গেছেন। কবির এই আকস্মিক অন্তর্ধানে পাঠক যত বিস্মিত হয়, তার চেয়ে বেশী হয় তাদের আপশোষ। 'কড়ি ও কোমলে'র-

রচয়িতা যে তরুণ যুবক কবি, তাঁর ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ জীবনের কোনো কথাই রবীন্দ্রনাথ কবুল করেন নি। বায়রন বা গ্যেটের পত্রাবলী ও আত্মজীবনীতে যে অন্তরঙ্গ গোপন কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তা কিছুই বলেন নি। 'জীবনস্মৃতি'তে যা অনুদ্ঘাটিত, তা 'ছিন্নপত্রে' উদ্ঘাটিত হয়েছে। পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় এখানে ছড়িয়ে আছে। সেদিক থেকে 'ছিন্নপত্রে'র একটি অনন্যসাধারণ গুরুত্ব আছে। কাব্যে যা অসম্পূর্ণ, আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত, তা এখানে ✓ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়েছে। 'ছিন্নপত্রে'র মধ্যে এমন অনেক ইঙ্গিত আছে যা থেকে মধ্যযৌবনে উপনীত রবীন্দ্রনাথের মুখে অনেক কনফেশ্যন শোনা যায়—যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। অবশ্য 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ নির্মমভাবে অনেক ছাঁটকাট করেছেন।

'ছিন্নপত্রে' যে রবীন্দ্রনাথকে পাই, তিনি সর্বদা সামাজিকতা রক্ষা করে চলেন নি। সভ্যতা, শিষ্টতা, সমাজ-সংস্কার, তত্ত্ব-প্রচার, ধর্ম-ব্যাখ্যান— ✓ এ সবই বাইরের, কবির আন্তরতৃপ্তি এসবের দ্বারা ঘটে না। 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' সম্পাদনা বা মাসের পর মাস লেখা যুগিয়ে যাওয়া—কিছুই না, ব্যর্থ পরিশ্রম, অথবা বিষয়-কর্ম—নিতান্ত অসারকর্ম। এই ধরনের চিন্তা 'ছিন্নপত্রে' মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ৮, ১৩, ১৫, ২২, ৫১, ৫২, ৬৯, ৮৪, ৮৫, ৯২, ৯৬, ১০৩, ১০৪, ১১০, ১৩৫, ১৩৬, ১৫০-সংখ্যক পত্র তার পরিচয়স্থল।

কয়েকটি যদৃচ্ছা-উদ্ধৃত মন্তব্য এর পোষকতা করবে:

(ক) ইচ্ছা করছে, শীতটা ঘুচে গিয়ে প্রাণ খুলে বসন্তের বাতাস দেয়—আচকানের বোতামগুলো খুলে একবার খোলা জালিবোটের উপর পা ছড়িয়ে দিই এবং কর্তব্যের রাস্তা ছেড়ে দিনকতক সম্পূর্ণ অকেজো কাজে মন দিই। বছরের ছ মাস আমি এবং ছ মাস আর কেউ যদি সাধনার সম্পাদক থাকে তা হলেই ঠিক সুবিধামত বন্দোবস্ত হয়। কারণ, সম্বৎসর খেপামি করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই এবং সম্বৎসর অপ্রমত্ততা বজায় রেখে চলা আমার মতো লোকের দুঃসাধ্য। (১৩৫-সং পত্র)

(খ) আমার দিনগুলিকে রথীর কাগজের নৌকার মতো একটি একটি করে ভাসিয়ে দিচ্ছি। কেবল মাঝে মাঝে একটি-আধটি গান তৈরি করছি এবং শরৎকালের প্রহরগুলির মধ্যে কুণ্ডলায়িত হয়ে পড়ে আছি। এই অপর্যাপ্ত

জ্যোতির্ময় নীলাকাশ আমার হৃদয়ের মধ্যে অবনত হয়ে পড়েছে, আলোক রক্তের মধ্যে প্রবেশ করছে, সর্বব্যাপী স্তব্ধতা আমার বক্ষকে দুই হাতে বেষ্টন করে ধরেছে, একটি সকরুণ শান্তি আমার ললাটের উপর চুম্বন করেছে।…এর পরে কর্ম যখন আবার আমাকে একবার হাতে পাবেন তখন টুঁটি চেপে ধরবেন ; তখন আমার এই ঘরের লোকটি, আমার এই ছুটির কর্ত্রী কোথায় থাকবেন তাঁর আর উদ্দেশ পাওয়া যাবে না। প্রায় মাঝে মাঝে মনে করি সাধনার লেখার ঝুড়ি পদ্মার জলে ভাসিয়ে দেব ; কিন্তু জানি, ভাসিয়ে দিলেও সে আমাকে তার পিছন পিছন টেনে নিয়ে চলবে। (১৫০-সং পত্র)।

(গ) কলকাতাটা বড় ভদ্র এবং বড় ভারী, গবর্মেণ্টের আপিসের মত। জীবনের প্রত্যেক দিনটাই যেন একই আকারে একই ছাপ নিয়ে টাঁকশাল থেকে তক্‌তকে হয়ে কেটে কেটে বেরিয়ে আসছে—নীরস মৃত দিন, কিন্তু খুব ভদ্র এবং সমান ওজনের। এখানে [পতিসর] প্রত্যেক দিন আমার নিজের দিন—নিত্যনিয়মিত-দম-দেওয়া কলের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার আপনার মনের ভাবনাগুলি এবং অখণ্ড অবসরটিকে হাতে করে নিয়ে মাঠের মধ্যে বেড়াতে যাই—সময় কিম্বা স্থানের মধ্যে কোনো বাধা নেই। সন্ধ্যেটা জলে স্থলে আকাশে ঘনিয়ে আসতে থাকে—আমি মাথাটি নিচু করে আস্তে আস্তে বেড়াতে থাকি। (৯৮-সং পত্র)

এই তিনটি উদ্ধৃতি থেকেই বন্ধন-অসহিষ্ণু প্রকৃতিপ্রেমী সামাজিকতা-বিরোধী কবিকে চিনে নিতে পারি। এই ধরনের স্বীকৃতি আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তরুণ যৌবনের উদাসী বাউল এখানে বিরল মুহূর্তে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

'ছিন্নপত্রে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, তা আত্ম-সন্ধানী প্রকৃতিপ্রেমী রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। কবির আত্ম-জিজ্ঞাসা ও নিসর্গ-জিজ্ঞাসা—'ছিন্নপত্রে'র দুটি মূল সুর। সাহিত্যজীবনে কবি যে নোতুন জগতে প্রবেশ করেছেন, যেখানে 'সোনার তরী'-'চিত্রা'-'চৈতালী'-'গল্পগুচ্ছে'র নির্বিশেষ সৌন্দর্য-সন্ধান ও সবিশেষ মর্তমমতা অপূর্ব রূপলাবণ্যে আবিষ্কারের আনন্দে ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ নবতর সৌন্দর্যলোক রচনা করেছে, 'ছিন্নপত্রে' তারই স্পষ্ট স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়েছে।

কবির আত্মপরিচয় এখানে প্রকট। তিনি বলেছেন, "সাধনাই লিখি

আর জমিদারি দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।” (৮০-সং পত্র)

'ছিন্নপত্র' এই আত্মস্বীকৃতির আলোকে উজ্জ্বল হয়ে আছে, রবীন্দ্র-মানসের মর্মকোষের পরিচয় এখানে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

॥ ৩ ॥

'ছিন্নপত্রে'র শতকরা আশিটি পত্রের রচনাস্থল পদ্মাবক্ষ। কবি তখন জমিদারি পরিদর্শন উপলক্ষে মধ্যবঙ্গের হৃদয়দেশে পদ্মা ও তার শাখানদী-গুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। গত শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ পদ্মাপ্রকৃতি থেকেই নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য ও মানবিক সত্যের প্রেরণা গ্রহণ করেছিলেন। পদ্মা, যমুনা, আত্রেয়ী, নাগর, বড়ল, গোরাই ও ইছামতী নদীর কলধ্বনি সেদিনের গল্পে-কবিতায়-গানে শোনা যায়। পদ্মার জন্য কেবল ব্যাকুলতা নয়, তীব্র ভালবাসা ও সেই সঙ্গে আশঙ্কামিশ্রিত আকর্ষণও কবি অনুভব করেছেন। তা 'ছিন্নপত্র'পাঠে অনুভব করা যায়। আর এর মধ্যেই তিনি কাব্যজীবনের নবতর অভিজ্ঞতালোকে পদার্পণ করেছেন। 'সোনার তরী' 'চিত্রা'র যে প্রকৃতিপ্রেম, তা বাংলা কাব্যে ও রবীন্দ্রকাব্যে অনাস্বাদিত প্রেম। এই প্রেমে বাংলা কাব্যের নবজন্ম হয়েছে। 'ছিন্নপত্র' এই প্রেমের প্রাথমিক খসড়া।

নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে সেদিন সঙ্গ দিয়েছে চঞ্চলা পদ্মা—সুখদুঃখভরা গ্রামগুলি, নির্জন বালুচর, সুনীল আকাশ, রহস্যময় মধ্যাহ্ন ও মোহিনী সন্ধ্যা। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই মন্তব্যটি অনিবার্যরূপে মনে পড়ে, সেটি উদ্ধার করার লোভ সংবরণ করা দুঃসাধ্য। “আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি—বৈশাখের খররৌদ্রতাপে শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে! পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার

তুলি। এইখানে নির্জনসজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে।" (রচনাবলী সংস্করণ, 'সোনার তরী'র ভূমিকা)।

পদ্মাপ্রকৃতিই এ সময়ে কবির নিত্যসঙ্গী, প্রেরণাদায়িনী, মানসী। সেই সঙ্গে যে-ক'টি গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের নিত্যসঙ্গী ছিল, তার মধ্যে প্রধান হল 'আমিয়েলের জর্নাল'। 'ছিন্নপত্রে' কবি স্বীকার করেছেন, "আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে—আমি লোকেনের ওখান থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি, যখনই সময় পাই সেই বইটা উল্টে পাল্টে দেখি; ঠিক মনে হয়, তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্ছি; এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। অনেক বই এর চেয়ে ভাল লেখা আছে এবং এই বইয়ের অনেক দোষ থাকতে পারে। কিন্তু এই বইটি আমার মনের মত। অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয়, কোনটা ঠিক আরামের বোধ হয় না—যেমন রোগের সময় অনেক সময় ঠিক আরামের অবস্থাটি পাওয়া যায় না, নানা রকমে পাশ ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে; কখনও বালিশের উপর বালিশ চাপাই, কখনও বালিশ ফেলে দিই—সেই মানসিক অবস্থায় আমিয়েলের যেখানেই খুলি সেখানেই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে, শরীরটা ঠিক বিশ্রাম পায়।" (১০১-সং পত্র)

আমিয়েলকে কবি বলেছেন 'নির্জনের প্রিয় বন্ধু', 'অন্তরঙ্গ বন্ধু'। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সাক্ষ্য দিয়েছেন, "এই গ্রন্থখানি কবির খুব ভাল লাগে, বহুবার ইহার কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি।" ('রবীন্দ্রজীবনী', ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ ৩০০)। জেনিভাবাসী কবি-দার্শনিক-অধ্যাপক আঁরি ফ্রেডরিক আমিয়েল (১৮২১-১৮৮১) তাঁর 'জর্নাল ইন্‌টাইম' গ্রন্থের দ্বারা পদ্মাবিহারী রবীন্দ্রনাথের উপর কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তা আলোচনার যোগ্য। এই জর্নালের আলোকে 'ছিন্নপত্র' পাঠ করলে আমরা নোতুন করে 'ছিন্নপত্র' ও পত্ররচয়িতা—উভয়কেই চিনে নিতে পারি।

আমিয়েল ব্যক্তিগত জীবনে ও সাহিত্যজীবনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। জেনিভার এই বিদগ্ধ অধ্যাপক সৌন্দর্য-দর্শন সম্পর্কে ভাষণমালা ও কিছু কবিতা রচনা করেন। কিন্তু তা থেকে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন নি। মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু মঁসিও শেরার তাঁর ডায়েরি সম্পাদনা করে Journal Intime ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভাতে প্রকাশ করেন। ১৮৪৮ থেকে ১৮৮১—এই চৌত্রিশ বৎসরের দিনলিপি থেকে নির্বাচিত সংকলন এই গ্রন্থ।

সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানি—এই দুই দেশে রচিত দিনলিপিতে একটি বিদগ্ধ প্রকৃতিপ্রেমী সংস্কৃতিবান মনের পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়; অনুবাদিকা মিসেস হামফ্রিওআর্ড। দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। লোকেন্দ্রনাথ পালিত এই সংস্করণটি রবীন্দ্রনাথকে দেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ সম্পর্কে উপরোক্ত স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ১৮৯১ থেকে ১৯০০— এই দশ বৎসর কবি মধ্যবঙ্গে বাস করেন, তারপর পত্নীর আপত্তিতে শিলাইদহের বাস উঠিয়ে বোলপুরে চলে যান। এই পর্বে 'আমিয়েলের জর্নাল' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিল। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে (১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে সবুজপত্রে প্রথম প্রকাশিত) 'আমিয়েলের জর্নালে'র দুবার উল্লেখ আছে; নিখিলেশ বইটির ভক্ত ছিলেন।

আমিয়েলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যকর্মে অনেক মিল আছে, বহুতর অমিলও আছে। উভয়েই কবি-দার্শনিক, উভয়েই অন্তর্মুখী, উভয়েই প্রকৃতিপ্রেমী। সমাজ ও দেশের আহ্বানে, রাজনীতিতে ও দর্শনালোচনায় উভয়েই সাড়া দিয়েছেন, কিন্তু তার থেকে সরে গিয়ে উভয়েই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। বাল্যকালে উভয়েই নির্জনতাপ্রিয় রোমাণ্টিক কিশোর ছিলেন। যৌবনে উভয়েই বিষাদ ও বৈরাগ্য, ঔদাস্য ও রোমাণ্টিক ব্যাকুলতার কবলে পড়েছেন ও তার থেকেই তাঁদের মহৎ সাহিত্যকর্মের জন্ম হয়েছে। উভয়েই পত্ররচনায় নিপুণ ছিলেন; ভ্রমণে ও প্রকৃতি-সঙ্গে উভয়েরই প্রবল আসক্তি ছিল। উভয়েই বারবার হতাশা ও নিষ্ফলতার দ্বারা পিষ্ট হয়েছেন এবং প্রকৃতি-সঙ্গে নবজীবন ও নবীন আশায় উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করেছেন। উভয়েরই কবিতা ও দিনলিপি-পত্রে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। জ্ঞানের নানাক্ষেত্রে উভয়েরই স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল।

অমিল এইখানে যে, আমিয়েল ষাট বৎসরের জীবনে বিশেষ কিছুই লিখতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথ আশি বৎসরের জীবনে অজস্র সহস্রবিধ রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমিয়েল নিষ্ফলতা ও আলস্যের সহস্র সঞ্চয় নিয়ে গত হয়েছেন, সাহিত্যিক বন্ধ্যদশায় রাহুগ্রস্ত হয়েছেন, নিঃসঙ্গ কৌমার্যের দুঃসহ ভার ও বেদনা বহন করেছেন, মঁসিআ শেরারের কথায়— "আমরা ঠিক বুঝতে পারি না এত শক্তিসম্পন্ন লেখকের পক্ষে তুচ্ছ অথবা কিছুই সৃষ্টি করা সম্ভব হল না কেন?" অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ

সংসারে ও সমাজে কর্মীরূপে দেখা দিয়েছেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সহস্র কর্মের বন্ধনে ধরা দিয়েছেন, আবার এই বন্ধনকে মুহূর্তেই অস্বীকার করে সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্বর্ণপ্রসবী লেখনী নিরন্তর চালনা করেছেন, সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সকল দুঃখ হতাশা ও ঔদাস্যের উপরে তাঁর মানবপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম জয়লাভ করেছে। 'আমিয়েলের জর্নাল' তাঁর সাতাশ বৎসর থেকে যাট বৎসর বয়স (মৃত্যুকাল) পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত গোপন দিনলিপির নির্বাচিত সংকলন এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত; জীবদ্দশায় এগুলির প্রকাশ আমিয়েলের অভিপ্রেত ছিল না। অপরপক্ষে 'ছিন্নপত্র' রবীন্দ্রনাথের চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত দশ বৎসরের কাল-পরিধির মধ্যে লিখিত, আত্মীয় ও বন্ধুদের উদ্দেশে প্রেরিত, সামাজিক-পারিবারিক পরিবেশের প্রতি সচেতন থেকে রচিত এবং লেখকের জীবদ্দশায় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। 'জর্নাল ইন্‌টাইম'-এ একটি অনুভূতিপ্রবণ অতিসচেতন বিদগ্ধ মানসের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দর্শনজিজ্ঞাসার পরিচয়ই প্রধান; 'ছিন্নপত্রে' একটি তরুণ কবিমানসের আত্মজিজ্ঞাসা ও নিসর্গজিজ্ঞাসা রয়েছে, কিন্তু এখানে প্রাধান্য পেয়েছে প্রকৃতিপ্রেমী মনের নির্বিশেষ সৌন্দর্যসন্ধান ও সবিশেষ মর্তমমতা।

॥ ৪ ॥

'ছিন্নপত্রে' দেখি নির্জনসজনের নিত্যসংগমে জাত প্রকৃতিপ্রেম—তার একদিকে পদ্মা, অপরদিকে পদ্মাতীরের জনপদ; একদিকে নির্বিশেষে সৌন্দর্য-সন্ধান—'সোনার তরী' 'চিত্রা', অপরদিকে সবিশেষ মর্তমমতা—'গল্পগুচ্ছ'। 'জর্নাল ইনটাইম'-এ একটি মহৎ প্রতিশ্রুতিসমৃদ্ধ কবিমানসের অপমৃত্যু; অস্তিত্বের জিজ্ঞাসায় পীড়িত মানবাত্মার আর্তনাদ। এখানেই 'ছিন্নপত্র' 'আমিয়েলের জর্নাল' থেকে ভিন্নতর। জর্নালে আমিয়েলের খ্রীষ্টীয় ধর্মবোধ অতি প্রবল, 'ছিন্নপত্রে' ধর্মবোধ কখনই প্রকট নয়।

জর্নাল পড়লে মনে হয় একজন স্বর্গভ্রষ্ট দেবকুমারের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি: "যে মুহূর্তে একটি বস্তু আমাকে আকর্ষণ করে, আমি সে মুহূর্তে তা থেকে সরে যাই, কেননা অপেক্ষাকৃত-ভাল দ্বিতীয়ে আমার মন ওঠে না; আমার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিদায়ক কিছু আমি আবিষ্কার করতে পারি না।

বাস্তব আমাকে হতাশ করে, আর আদর্শকে খুঁজে পাই না।" আদর্শ সৌন্দর্য-সন্ধানে এই বেদনা ও বাস্তবের কঠিন আঘাতে মোহভঙ্গ প্রত্যেক মহৎ শিল্পীরই কথা। সংসার, প্রেম, বিবাহ, জীবনসঙ্গিনী—এ সবই আমিয়েলকে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু হায়, সে সাধ কখনও পূরণ হয় নি, তাই জর্নালে ধ্বনিত হয়েছে এই ক্রন্দন: "বাস্তব, বর্তমান, অপ্রতিকার্য পরিস্থিতি ও প্রয়োজন আমাকে প্রতিনিবৃত্ত এমন কি ভীত করে তোলে। কল্পনা, বিবেকবুদ্ধি ও সূক্ষ্মবুদ্ধি আমার প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ চরিত্রবলের অভাব আছে। কেবল চিন্তাসমৃদ্ধ জীবনই আমার কাছে স্থিতিস্থাপকতা ও অসীমতায় পূর্ণ বলে মনে হয়—এর দ্বারা আমি অপ্রতিকার্য অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করি। বাস্তব জীবন আমাকে ভীত করে তোলে। অহং জীবন ও সুখকে আমি আমারই কারণে বিশ্বাস করি না। আদর্শ আমার সকল অসম্পূর্ণ অধিকারকে বিনষ্ট করে এবং আমি সকল মূল্যহীন দুঃখ ও অনুতাপকে ঘৃণা করি।" (৬ এপ্রিল, ১৮৫১ সনের দিনলিপি, জেনিভা)। এইখানেই আমিয়েলের ট্র্যাজেডি। এই অশান্ত আত্মজিজ্ঞাসা, বিশ্বাসের শোচনীয় অভাব ও বাস্তবের অপূর্ণতার গভীর বেদনা আমিয়েলের সমস্ত প্রতিশ্রুতিকে বিনষ্ট করেছে এবং শেষ পর্যন্ত বিশেষ কিছুই তিনি সৃষ্টি করে যেতে পারেন নি। 'আমিয়েলের জর্নালে' খ্রীষ্টীয় নীতিবোধ, মায়া, ব্রহ্ম, কর্ম, পাপ, পুণ্য সম্পর্কে গুরু আলোচনা মনের ওপর দুঃসহ ভারের মতে চেপে বসে।

আমাদের অশেষ সৌভাগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই দুঃখকর ট্র্যাজেডি ঘটে নি। বাস্তবের অপূর্ণতায় তিনিও বেদনা পেয়েছেন, নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-সন্ধানে ব্যাকুল হয়েছেন, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যোগসাধনের ব্যর্থতায় পীড়িত হয়েছেন, কিন্তু সুগভীর মানবপ্রেম তাঁকে রক্ষা করেছে। ৮৪, ৮৮, ৯৬, ১০৩, ১০৪, ১১০, ১১৫, ১১৭, ১২৩, ১২৪, ১৩৮-সংখ্যক পত্রে এই আশঙ্কা, ব্যর্থতা ও অশান্তির পরিচয় পাই। কিন্তু তা স্থায়ী হয়ে কবিমনে মুদ্রিত হয়ে যায় নি, তার প্রমাণ পাই ২৬, ৮৫, ১১২, ১১৬, ১২০, ১২২, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৯-সংখ্যক পত্রে। শেষোক্ত পত্রগুলিতে আশ্বাস ও সান্ত্বনা পাই। অস্তিত্ব-সম্পর্কিত গুরু আলোচনা এখানে 'আমিয়েলের জর্নালে'র মত সৌন্দর্য সম্ভোগের পথে বাধা উপস্থিত করে নি।

'ছিন্নপত্রে'র একদিকে হতাশা ও নিষ্ফলতার বেদনা ধ্বনিত হয়ে ওঠে, অপর দিকে সুগভীর ধরণীপ্রীতি ও মানবপ্রেম বড় হয়ে ওঠে।

কী আশ্চর্য আত্মস্বীকৃতিঃ

(ক) যখন মনে করি, জীবনের পথ সুদীর্ঘ, দুঃখকষ্টের কারণ অসংখ্য এবং অবশ্যম্ভাবী, তখন এক-এক সময় মনের বল রক্ষা করা প্রাণপণ কঠিন হয়ে পড়ে।...জীবনে একটা প্যারাডক্স প্রায়ই দেখা যায় যে, বড় দুঃখের চেয়ে ছোট দুঃখ যেন বেশী দুঃখকর। তার কারণ, বড় দুঃখে হৃদয়ের যেখানটা বিদীর্ণ হয়ে যায় সেইখান থেকেই একটা সান্ত্বনার উৎস উঠতে থাকে; মনের সমস্ত দলবল, সমস্ত ধৈর্যবীর্য এক হয়ে আপনার কাজ করতে থাকে; তখন দুঃখের মাহাত্ম্য দ্বারাই তার সহ্য করবার শক্তি বেড়ে যায়। ছোট দুঃখের কাছে আমরা কাপুরুষ কিন্তু বড় দুঃখ আমাদের বীর করে তোলে, আমাদের যথার্থ মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে দেয়। তার ভিতরে একটা সুখ আছে। (১০৩-সং পত্র)

(খ) আমার বিশ্বাস, আমাদের প্রীতিমাত্রই রহস্যময়ের পূজা; কেবল সেটা আমরা অচেতনভাবে করি। ভালবাসা মাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বের অন্তরতম একটি শক্তির সজাগ আবির্ভাব, যে নিত্য আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি। নইলে ওর কোনও অর্থই থাকে না। (১১৫-সং পত্র)

(গ) [বেদান্ত বলেন] সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরাও নেই, আছেন কেবল ব্রহ্ম, আর মনে হচ্ছে যেন আমরা আছি। আশ্চর্য এই, মানুষ মনে একথা স্থান দিতে পারি। আরও আশ্চর্য এই, কথাটা শুনতে যত অসঙ্গত আসলে তা নয়—বস্তুত কিছুই যে আছে সেইটে প্রমাণ করাই শক্ত। যাই হোক, আজকাল সন্ধ্যাবেলায় যখন জ্যোৎস্না ওঠে এবং আমি যখন অর্ধনিমীলিত চোখে বোটের বাইরে কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি, স্নিগ্ধ সমীরণ আমার চিন্তাক্লান্ত তপ্ত ললাট স্পর্শ করতে থাকে, তখন এই জল স্থল আকাশ, এই নদীকল্লোল, ডাঙার উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধজন পথিক, জলের উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধখানা জেলেডিঙির গতায়াত, জ্যোৎস্নালোকে অপরিস্ফুট মাঠের প্রান্ত, দূরে অন্ধকারজড়িত বনবেষ্টিত সুপ্তপ্রায় গ্রাম—সমস্তই ছায়ারই মতো, মায়ারই মতো বোধ হয়,

অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশী সত্য হয়ে জীবনমনকে জড়িয়ে ধরে, এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মুক্তি একথা কিছুতেই মনে হয় না। (১১৭-সং পত্র)

(ঘ) আমি অনেক সময় ভেবে দেখেছি, সুখী হলুম কি দুঃখী হলুম সেইটে আমার পক্ষে শেষ কথা নয়। আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখদুঃখের ভিতরে নিজের একটা প্রসার অনুভব করতে থাকে।…আমাদের ক্ষণিক জীবনই সুখদুঃখ ভোগ করে; আমাদের চিরজীবন সেই সুখ-দুঃখ নেয় না, তার থেকে একটা তেজ সঞ্চয় করে। (১২৩-সং পত্র)

(ঙ) নিজের সেই সুগভীর স্বপ্নাবিষ্ট বাল্যকালের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার কথা মনে পড়ছে—খুব বেশী দিনের কথা বলে তো মনে হচ্ছে না—অথচ এবারকার মানবজন্মের অর্ধেক দিন তো চলে গেছেই। আমরা প্রত্যেক মুহূর্ত মাড়িয়ে মাড়িয়ে জীবনটা সম্পূর্ণ করি। কিন্তু মোটের উপরে সবটা খুবই ছোট; দুটি ঘণ্টা কালের নির্জন চিন্তার মধ্যে সমস্তটাকে ধারণ করা যেতে পারে।…আজকের আমার এই একলা বোটের দুপুরবেলাকার মনের ভার এই একটা দিনের কুঁড়েমি সেই কয়েকখানা পাতার মধ্যে কোথায় বিলুপ্ত হয়ে থাকবে। এই নিস্তরঙ্গ পদ্মাতীরের নিস্তব্ধ বালুচরের উপরকার নির্জন মধ্যাহ্নটি আমার অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের মধ্যে কি কোথাও একটি ক্ষুদ্র সোনালি রেখার চিহ্ন রেখে দেবে। (১৩৮-সং পত্র)

(চ) যতক্ষণ অপূর্ণতা ততক্ষণ অভাব, ততক্ষণ দুঃখ থাকবেই। জগৎ যদি জগৎ না হয়ে ঈশ্বর হত তা হলেই কোথাও কোন খুঁত থাকত না —কিন্তু ততটা দূর পর্যন্ত দরবার করতে সাহস হয় না। ভেবে দেখলে সকল কথাই গোড়ায় গিয়ে ঠেকে যে, সৃষ্টি হল কেন—কিন্তু সেটা সম্বন্ধে কোনও আপত্তি যদি না করা যায়, তা হলে জগতে দুঃখ রইল কেন এ নালিশ উত্থাপন করা মিথ্যা। সেই জন্যে বৌদ্ধেরা একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ মারতে চায়; তারা বলে যতক্ষণ অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ দুঃখের সংশোধন হতে পারে না, একেবারে নির্বাণ চাই। খ্রীষ্টানরা বলে দুঃখটা খুব উচ্চ জিনিস, ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হয়ে আমাদের জন্য দুঃখ বহন করেছেন। কিন্তু নৈতিক দুঃখ এক, আর পাকা ধান ডুবে যাওয়ার দুঃখ আর। আমি বলি, যা হয়েছে বেশ হয়েছে, এই-যে আমি হয়েছি এবং আশ্চর্য জগৎ হয়েছে, বড় তোফা হয়েছে—এমন জিনিসটা নষ্ট না হলেই ভাল। বুদ্ধদেব তদুত্তরে বলেন,

এ জিনিসটা যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে দুঃখ সইতে হবে। আমি নরাধম তদুত্তরে বলি, ভাল জিনিস এবং প্রিয় জিনিস রক্ষা করতে যদি দুঃখ সইতে হয় তা হলে দুঃখ স'ব—তা আমি থাকি আর আমার জগৎটি থাকুক; মাঝে মাঝে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, মনঃক্ষোভ, নৈরাশ্য বহন করতে হবে, কিন্তু সে দুঃখের চেয়ে যখন অস্তিত্ব ভালবাসি এবং অস্তিত্বের জন্যই সে দুঃখ বহন করি তখন তো আর কোনো কথা বলা শোভা পায় না। (৮৮-সং পত্র)

(ছ) যত বিচিত্র রকমের কাজ হাতে নিচ্ছি ততই কাজ জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধা বাড়ছে। কর্ম যে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ সেটা কেবল পুঁথির উপদেশরূপেই জানতুম। এখন জীবনেই অনুভব করছি কাজের মধ্যে পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা; কাজের মধ্য দিয়েই জিনিস চিনি, মানুষ চিনি, বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে মুখামুখি পরিচয় ঘটে।...কঠিন কর্মক্ষেত্রে মর্মান্তিক শোকেরও অবসর নেই। অবসর নিয়েই বা ফল কি। কর্ম যদি মানুষকে বৃথা অনুশোচনার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্মুখের পথে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে পারে, তবে ভালই তো। যে মেয়ে মরে গেছে তার জন্যে শোক করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি নে, যে ছেলে বেঁচে আছে তার জন্যে ছোট বড় সব কাজই তাকিয়ে আছে। কাজের সংসারের দিকে চেয়ে দেখি, কেউ চাকরি করছে, কেউ ব্যবসা করছে, কেউ চাষ করেছে, কেউ মজুরি করছে; অথচ এই প্রকাণ্ড কর্মক্ষেত্রের ঠিক নীচে দিয়েই প্রত্যহ কত মৃত্যু, কত দুঃখ গোপনে অন্তঃশীলা বহে যাচ্ছে, তার আবরু নষ্ট হতে পারছে না—যদি সে অসংযত হয়ে বেরিয়ে আসত তা হলে কর্মচক্র একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত। ব্যক্তিগত শোক-দুঃখটা নীচে দিয়ে ছোটে, আর উপরে অত্যন্ত কঠিন পাথরের ব্রীজ বাঁধা, সেই ব্রিজের উপর দিয়ে লক্ষলোকপূর্ণ কর্মের রেলগাড়ি আপন লৌহপথে হুহুঃশব্দে চলে যায়, নির্দিষ্ট স্টেশনটি ছাড়া আর কোথাও কারো খাতিরে মুহূর্তের জন্যে থামে না। কর্মের এই নিষ্ঠুরতায় মানুষের কঠোর সান্ত্বনা। (১৪৭-সং পত্র)

আমিয়েল যেখানে বাস্তবের অপূর্ণতা ও দুঃখে বেদনার্ত হয়েছেন, বলেছেন, "বাস্তব, বর্তমান, অপ্রতিকার্য পরিস্থিতি ও প্রয়োজন আমাকে প্রতিনিবৃত্ত এমন কি ভীত করে তোলে", সেখানে রবীন্দ্রনাথের এই মহৎ

কঠোর পবিত্র সান্ত্বনা আমাদের আশ্বস্ত করে। 'আমিয়েলের জর্নালে' এ ধরনের দিনলিপি পড়ে আমাদের মন ক্লিষ্ট হয়, 'ছিন্নপত্র' আমাদের সান্ত্বনা দেয়, সংসারের কখন কর্তব্যের মুখোমুখি হতে বল দান করে।

'আমিয়েলের জর্নাল' তাঁর জীবনব্যাপী ব্যর্থতা দুর্বলতা পরাজয়ের ট্রাজিক ইতিহাস। 'ছিন্নপত্র' সেক্ষেত্রে মর্তমমতা ও জীবনপ্রীতির টেস্টামেণ্ট। আমিয়েল পরিবেশের কাছে হার মেনেছেন, রবীন্দ্রনাথ তার ওপর জয়লাভ করেছেন। আমিয়েলের সকল ব্যর্থতা ও দুর্বলতা দূর হয়ে গেছে সেই মুহূর্তে যখন তিনি প্রকৃতিপ্রেমে উজ্জীবিত হয়েছেন। মধ্য ইয়োরোপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরস আমিয়েল দু হাতে অঞ্জলি ভরে আকণ্ঠ পান করেছেন, আর সেখানেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী। বোধকরি এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ আমিয়েলকে তাঁর 'নিত্যসঙ্গী', 'অন্তরঙ্গ বন্ধু' বলে অভিহিত করেছেন। উভয়েই প্রকৃতির প্রতি আলিঙ্গনের ব্যগ্র বাহু বিস্তার করেছেন এবং ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে তাকে বেঁধেছেন। প্রকৃতির মধ্যে একটি লাবণ্যময়ী দিব্যসত্তার উপস্থিতি উভয়েই অনুভব করেছেন। এখানে উভয়েই প্রকৃতির অন্তরসত্তাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছেন।

সুইজারলাণ্ডের নীল আকাশ, আল্পস্ হিমাদ্রি এবং শান্ত 'লেক'সমূহ আমিয়েলের মনোহরণ করেছে, তপ্তমধুর এপ্রিলের বাসন্তী দিনগুলি সুধায় ভরে তাঁর কাছে এসেছে, তিনি আকণ্ঠ সে সুধা পান করেছেন। কী গভীর আনন্দ সেই সব রঙিন দিনগুলি বহন করে এনেছে, তার পরিচয় জর্নালের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। জেনিভাতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিলের দিনলিপিতে আমিয়েল লিখেছেন: "আমি আজ সকালে মনের উপর আবহাওয়ার আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছি। নিজেকে ইতালিয়ান বা স্পেনীয় বলে মনে হল। এই নীল স্বচ্ছ আকাশে দক্ষিণায়নের সূর্যালোকে প্রাচীরগুলি তোমার দিকে তাকিয়ে হাসছে বলে মনে হচ্ছে। চেস্টনাট গাছগুলি উৎসব-সাজে সেজেছে। তাদের শাখাপ্রান্তে দ্যুতিমান কুঁড়িগুলি ছোটছোট আলোকশিখার মত দীপ্তি বিকিরণ করছে, মনে হয় তারা যেন অনন্ত প্রকৃতির বসন্ত-উৎসবের উজ্জ্বল দীপাবলী। সব কিছুই কত নবীন; কত কোমল, কত করুণাময়!—ঘাসের শিশিরস্নাত সতেজভাব, আঙিনার স্বচ্ছ ছায়া, পুরনো গীর্জা-চূড়াগুলির মহান শক্তি, পথের সাদা প্রান্ত—সবই সুন্দর! নিজেকে শিশুর মত প্রাণোচ্ছ্বল মনে হল; আমার ধমনীতে

জীবনীরস পুনঃপ্রবাহিত হয়। বিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগের ক্রিয়াটি কত মধুর!”

অপরদিকে পদ্মানদী, বালুচর, ধূসর তীররেখা, সুনীল আকাশ রবীন্দ্রনাথকে কত গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে তার পরিচয় ‘ছিন্নপত্রে’ বিকীর্ণ হয়ে আছে। আলোয় আকাশভরা বাংলার শরৎ-প্রকৃতির সকল রূপ কবি-দৃষ্টির সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। ‘ছিন্নপত্রে’র ১৪৫-সং পত্রটির সঙ্গে সদ্যধৃত দিনলিপির সাদৃশ্য কত গভীর, তা সহজেই অনুভববেদ্য। আলো আর আকাশের উদার আমন্ত্রণে আমিয়েলের মত রবীন্দ্রনাথও সমস্ত হৃদয় দিয়ে সাড়া দিয়েছেন: “কাজ করতে করতে কোনো একদিকে মুখ ফেরালেই দেখতে পাই, নীল আকাশের সঙ্গে মিশ্রিত সবুজ পৃথিবীর একটা অংশ একেবারে আমাদের ঘরের লাগাও হাজির—যেন প্রকৃতিসুন্দরী কুতূহলী পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত আমার জানালা-দরজার কাছে উঁকি মারছে; আমার ঘরের এবং মনের, আমার কাজের এবং অবসরের চারিদিকে নবীন ও সুন্দর হয়ে আছে। এই বর্ষণমুক্ত আকাশের আলোকে এই গ্রাম এবং জলের রেখা, এপার এবং ওপার, খোলা মাঠ এবং ভাঙা রাস্তা একটা স্বর্গীয় কবিতায় অ্যাপেলোদেবের স্বর্ণবীণাধ্বনিতে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি! আকাশ আমার সাকি, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা উপুড় করে ধরেছে—সোনার আলো মদের মত আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান করে দিচ্ছে। যেখানে আমার এই সাকির মুখ প্রসন্ন এবং উন্মুক্ত, যেখানে আমার এই সোনার মদ সব চেয়ে সোনালি ও স্বচ্ছ সেইখানে আমি কবি; সেইখানে আমি রাজা; সেইখানে আমার সঙ্গে বরাবর ওই সুনীল নির্মল জ্যোতির্ময় অসীমতার এই রকম প্রত্যক্ষ অব্যবহিত যোগ থাকবে।” [সাজাদপুর, ২ জুলাই, ১৮৯৫]

জেনিভা ও সাজাদপুরে দুস্তর ভৌগোলিক ব্যবধান, সময়ের ব্যবধানও আছে—১৮৫৫ ও ১৮৯৫, কিন্তু প্রকৃতি-সৌন্দর্য-উপভোগের অসহ্য উল্লাস একই। এই তীব্র উল্লাসে রবীন্দ্রনাথ ও আমিয়েল একই সৌন্দর্যলোকের দুই দেবকুমার!

আমিয়েল যেখানে বলছেন: “আবহাওয়া আশ্চর্যরকম উজ্জ্বল, উষ্ণ এবং পরিষ্কার। দিন পাখীর গানে মুখরিত, শর্বরী তারাশোভিত,—প্রকৃতি যেন করুণার প্রতিমা—করুণা ও দ্যুতিতে মিশে তা উজ্জ্বল হয়েছে। এই ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ

দুঃখের ভাবনায় প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের জন্য আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম।" [জেনিভা, ১৭ এপ্রিল, ১৮৫৫], সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "অনেককাল বোটের মধ্যে বাস করে হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়িতে এসে উত্তীর্ণ হলে বড় ভাল লাগে। বড় বড় জানালা দরজা, চারিদিক থেকে আলো বাতাস আসছে, যেদিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই গাছের সবুজ ডালপালা চোখে পড়ে এবং পাখির ডাক শুনতে পাই, দক্ষিণের বারান্দায় কেবলমাত্র কামিনী ফুলের গন্ধে মস্তিষ্কের সমস্ত রন্ধ্র পূর্ণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ বুঝতে পারি, এতদিন বৃহৎ আকাশের জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষুধা ছিল, সেটা এখানে এসে পেটভরে পূর্ণ করে নেওয়া গেল।...এখানকার দুপুরবেলাকার মধ্যে একটা নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখীদের বিশেষত কাকের ডাক, এবং সুন্দর সুদীর্ঘ অবসর—সবশুদ্ধ আমাকে উদাস করে দেয়। কেন জানি নে মনে হয়, এই রকম সোনালি রৌদ্রে ভরা দুপুরবেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে।" [সাজাদপুর, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ ১১৯-সং পত্র]

জেনিভার উষ্ণমধুর প্রসন্ন মধ্যাহ্ন আর পদ্মাতীরের সাজাদপুরের নির্জন সুন্দর সুদীর্ঘ অবসরস্নিগ্ধ মধ্যাহ্ন—দুজনকে একই সৌন্দর্যের জগতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'বৃহৎ আকাশের ক্ষুধা'র সঙ্গে উক্ত পত্রে আমিয়েলের অনুভূতির কী আশ্চর্য মিল, "এই সুনীল (আকাশ) সাগরে পৃথিবী ভাসছে বলে আমার মনে হল। এই গভীর শান্ত আনন্দানুভূতি একটি সম্পূর্ণ মানুষকে অভিষিক্ত করে, তাকে শুদ্ধ ও মহৎ করে তোলে। আমি নিজেকে এর হাতে সঁপে দিলাম, কৃতজ্ঞতা ও বশ্যতায় নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।"

বাংলাদেশের শরৎ-প্রসন্ন প্রভাতের সঙ্গে সুইজারলাণ্ডের হেমন্তের হেমকান্ত নীলিম আকাশতলের প্রভাতের একটি সুন্দর সাদৃশ্য আছে। ভাদ্র-আশ্বিনের সকাল পূর্ববাংলায় পদ্মাবক্ষে যে মোহ বিস্তার করে, অক্টোবরের সকাল আল্পস্-আশ্রিত সুইস 'লেক' অঞ্চলে হয়তো সেরূপ মোহ বিস্তার করে। 'আমিয়েলের জর্নালে' এরূপ একটি সকালের উল্লেখ আছে। দিনলিপির তারিখ ২৭ অক্টোবর ১৮৬৪, রঙ্গভূমি—Promenade de la Treille। আমিয়েল মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন—"এই প্রভাতে বাতাস এত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার যে ভোয়াশ নদীতে মানুষকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। সূর্যের প্রসন্ন উজ্জ্বল কিরণধারা

শরতের সকল রঙের আগুন জ্বালিয়েছে—সেখানে স্ফটিক-হলুদ, জাফরাণ, সোনালী, গন্ধক-হলুদ, গিরিমাটি-হলুদ, কমলা, লাল, তামা, সাগর-নীল, পারিজাত-নীল রঙ কুঞ্জের ঝরানো ও ঝরে-যাওয়া পাতায় পাতায় উজ্জ্বল রঙের উৎসব লাগিয়ে দিয়েছে। এ অতি তৃপ্তিকর দৃশ্য; আমাদের দুই সামরিক দলের পদধ্বনি, বন্দুকের শিস, শিঙ্গাধ্বনি, ঘরবাড়ীর তীক্ষ্ণ স্পষ্টরেখাগুলি—যা এখন পর্যন্ত প্রভাতী শিশিরসিক্ত, ছায়ার স্বচ্ছ শীতলতা—সব খুঁটিনাটি দৃশ্য এই সকালে গভীর সম্পূর্ণ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।"

অনুরূপ মুগ্ধ দৃষ্টির পরিচয় পাই 'ছিন্নপত্রে'র ৫৫-সংখক পত্রে (শিলাইদহ, ৩ ভাদ্র, ১৮৯২)। এখানে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন: "এমন সুন্দর শরতের সকালবেলা চোখের উপর যে কী সুধাবর্ষণ করছে সে আর কী বলব। তেমনি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে এবং পাখি ডাকছে। এই ভরানদীর ধারে, বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর, শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন্ এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসাবাসি চলেছে, তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্ধ-উদাস অর্ধ-সুখের ভার গাছের পাতা এবং ধানের খেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন—জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নিলীমা।...আমার সমস্ত মনটাকে কে যেন তুলিতে করে তুলে নিয়ে এই রঙিন শরৎপ্রকৃতির উপর আর-এক পোঁচ রঙের মতো মাখিয়ে দিচ্ছে, তাতে করে এই সমস্ত নীল সবুজ এবং সোনার উপর আর একটা যেন নেশার রঙ লেগে গেছে।"

রঙের ঘোর ও নেশার রঙ, উভয়েই প্রবল। শরৎ-সুন্দরীর মোহিনী আকর্ষণে উভয়েই ধরা দিয়েছেন এবং এই উল্লাস তারই স্বীকৃতি। রহস্যময়ী চঞ্চলা পদ্মা, এবং ধ্যানগম্ভীর আল্পস্ এই দুই কবিমনকে মহত্তর সৌন্দর্যলোকের পথে আকর্ষণ করেছে। এখানেই আমিয়েল এবং রবীন্দ্রনাথের সমধর্মিতা।

আমিয়েল আগে দার্শনিক, পরে কবি। রবীন্দ্রনাথ আগে কবি, পরে দার্শনিক। আমিয়েলের অশান্ত আত্মজিজ্ঞাসা, দর্শনচিন্তা ও আত্ম-অবিশ্বাস তাঁকে ব্যর্থতার পথে টেনে নিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাস ও সুগভীর মানবিকতা তাঁকে শুষ্ক দর্শনচিন্তার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে মহত্তর সফলতার স্তরে উত্তীর্ণ করেছে। এখানেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব। আমিয়েল মোহিনী প্রকৃতির সৌন্দর্য সুধা-

পানে উন্মত্ত হয়ে বলেছেন : "বেঁচে থাকা, অনুভব করা, প্রকাশ করার একটি প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ের অন্তস্তলকে আলোড়িত করেছে।" (৬ এপ্রিল, ১৮৬৯)। ঠিক তার পরই বিষণ্ণকণ্ঠে বলেছেন : "দুঃখ ও অসতের সমস্যা চিরকাল জীবনের প্রধান প্রহেলিকা হয়ে আছে ও থাকবে—জীবনের অস্তিত্বের পরেই এর স্থান।" (১৪ এপ্রিল ১৮৬৯)। রবীন্দ্রনাথ এই চিন্তাসঙ্কট থেকে মুক্ত ছিলেন তাঁর ধরণীপ্রীতি তথা মানবপ্রীতির জোরে। 'ছিন্নপত্র' পড়লে মনে হয়, পদ্মা একদিকে মানবসংসার, অপরদিকে বিশ্বলোক, একদিকে নির্বিশেষ সৌন্দর্যসাধনা, অপরদিকে সবিশেষ মর্তমমতা—এ দুয়ের মধ্যে যোগসাধন করেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের বিষাদ রোমান্টিক বিষাদ, তাঁর বৈরাগ্য ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির বৈরাগ্য। অস্তিত্বের চিন্তায় কোনো আত্মসঙ্কটের আবর্তে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে আমিয়েলের মত নিঃশেষিত করেন নি। 'ছিন্নপত্রে' তথা 'গল্পগুচ্ছে' ধ্বনিত হয়েছে 'মানবতার করুণ গীতধ্বনি', তরুণ যৌবনের উদাসী বাউল কবির বিষাদ যা 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র মর্মমূলে বর্তমান—তার মূল সুগভীর প্রকৃতিপ্রীতি, ছিন্নপত্রে'র ১৪, ১৮, ২৭, ৩৫, ৫৭, ৬৬, ১৫২-সংখ্যক পত্রগুচ্ছ তার পরিচয়স্থল। আর প্রকৃতিপ্রীতির অপরদিক সংসারপ্রীতি—সংসারবিরাগ নয়।

এই ভাবটি খুব সুন্দরভাবে কবি নিজেই ব্যক্ত করেছেন ১৪-সংখ্যক পত্রে : "এমন মনে করা যেতে পারে—মা পৃথিবী লোকালয়ের মধ্যে আপন ছেলেপুলে এবং কোলাহল এবং ঘরকন্নার কাজ নিয়ে থাকে ; যেখানে একটু ফাঁকা, একটু নিস্তব্ধতা, একটু খোলা আকাশ, সেইখানেই তার বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য এবং বিষাদ ফুটে ওঠে, সেইখানেই তার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়। ভারতবর্ষে যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতল আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই জন্য আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম বৈরাগ্য আবিষ্কার করতে পেরেছে ; এই জন্য আমাদের পূরবীতে কিম্বা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হা-হা ধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটি অংশ আছে যেটি কর্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায় নি। পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মিড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে। কাল সন্ধ্যের সময় নির্জন মাঠের মধ্যে পূরবী বাজছিল, পাঁচ-ছ ক্রোশের মধ্যে কেবল আমি একটি প্রাণী বেড়াচ্ছিলুম।"

'ছিন্নপত্রে'র শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে, কবির মনোজীবনের অভিলাষ, কাব্যসাধনা ও প্রেরণার কথা এতে প্রকাশিত হয়েছে। যে রোমান্টিক বিষাদ ও বৈরাগ্য এ-পর্বের রবীন্দ্র-সাহিত্যকে আশ্রয় করেছিল, তা যে অমূল তরু নয়, পদ্মাবাসী কবির জীবনে তা যে বাস্তব অপেক্ষা সত্য, উদাস বিষণ্ণ অবনতমুখী সন্ধ্যার চিত্রে তার সমর্থন পাই। সন্ধ্যার ব্যাকুল হৃদ্‌স্পন্দন কবিহৃদয়ের স্পন্দনের সঙ্গে মিলে গেছে। 'ছিন্নপত্রে' সন্ধ্যার বর্ণনা বারবারই এসেছে—সর্বত্রই এক সুর—দিগন্তের শেষ প্রান্তে 'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা'—তার যাত্রাপথে কোথাও আশ্বাস নেই, অসীম কারুণ্যেগভীর বিষাদে ছেয়ে আছে সে পথ। কবির স্বীকৃতি 'ছিন্নপত্রে' পাই, "আর কতবার বলব—এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে সন্ধ্যেটা কী চমৎকার, কী প্রকাণ্ড, কী প্রশান্ত, কী অগাধ! সে কেবল স্তব্ধ হয়ে অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করতে গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়।" (২৩-সং পত্র)

অবনতমুখী সন্ধ্যার বর্ণনায় কবি-লেখনী কখনও ক্লান্ত হয় নি। বোধ করি সন্ধ্যার সঙ্গে কবি এই পর্বে মনোজীবনের সাধর্ম্য অনুভব করেছিলেন, সন্ধ্যার আসনে যে বিষাদ, বৈরাগ্য ও কারুণ্য দেখেছিলেন, তা সেদিনের কাব্যসাধনায় ধরা পড়েছিল। মনোজীবনের মুক্তি কবি পেয়েছিলেন সন্ধ্যার অভিসারে, রাত্রির অভিমুখে সন্ধ্যার অভিসার তার মুক্তি ও সার্থকতার অভিসার। 'ছিন্নপত্রে'র শেষ (১৫২-সং) পত্রে এই সত্যটি অপরূপ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে: "কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শতসহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগযুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবী-মণ্ডলকে একাকিনী ম্লান নেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পিতৃগৃহ!"

এখানে যে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যযাত্রার কথা বলা হয়েছে, 'সোনার তরী'-'চিত্রা'য় তারই কাব্যরূপ পাই। 'ছিন্নপত্র' তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষ্য এবং জীবনভাষ্য সাধারণ পত্রসংকলন নয়, কবিমানসের অন্তরঙ্গ পরিচয়লাভের চাবিকাঠি।

জীবনস্মৃতি ঃ আলেখ্যদর্শন

'বঙ্গভাষার লেখক' (১৩১১ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যে আত্মপরিচয়মূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা বাংলা সাহিত্যে নানাকারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। 'সুদীর্ঘ-কালের কবিতালেখার ধারা'র অন্তরঙ্গ পরিচয় কবির নিকট এই প্রথম পাওয়া গেল। সেখানে কবি বলেছেন, "আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে, আমার তাহা নাই। না থাকিলেও ক্ষতি নাই, কারণ আমার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনায় কাহারো কোন লাভ দেখি না। সেইজন্য এ-স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম।"

বাংলা সাহিত্যের তিন রত্ন—মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ। প্রথম দুজন আত্মজীবনী লেখেন নি, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। তবে জীবনবৃত্তান্ত থেকে বৃত্তান্ত বাদ দিয়ে 'জীবন'কেই বড়ো করে তুলে ধরেছেন। উক্ত প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্র-নাথ বলেছেন, "জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয়, তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে,…তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।—

* * *

মানুষ আকারে বদ্ধ যে-জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাঁহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে,
কবিরে খুঁজিছ তাহারি জীবনচরিতে ?"

এই অমূল্য আত্মবিশ্লেষণের আলোকে রবীন্দ্রসাহিত্য বিচার্য।

দুঃখের বিষয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'দম্ভ ও অহমিকা'র সন্ধান পেয়েছিলেন [দ্রঃ 'কাব্যের উপভোগ', 'বঙ্গদর্শন', মাঘ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ] এবং এই অভিযোগ উপলক্ষ করে সেদিনের বাংলা সাময়িক সাহিত্যের পরিবেশ বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়েছিল ; একটি রবীন্দ্র-বিরোধী আন্দোলনের জন্ম হয় এই ঘটনায়। রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে যদিও বলেছিলেন, "বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে ও রচনার মধ্যে অনুভব করা অহংকার নহে। বরঞ্চ অহংকারের ঠিক উল্‌টা। কেননা, এই বিশ্বশক্তি কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে, তাহা সকলের মধ্যেই কাজ করিতেছে।" [দ্রঃ 'রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য', 'বঙ্গদর্শন', মাঘ ১৩১৪], তথাপি এই আক্রমণ ও বিরোধিতা তাঁকে বিশেষভাবে আহত করেছিল। এর পরেই 'প্রবাসী' মাসিকপত্রে ভাদ্র ১৩১৮ থেকে শ্রাবণ ১৩১৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এক বছর ধরে 'জীবনস্মৃতি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ও ১৩১৯ বঙ্গাব্দে [১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পূর্বোক্ত বিরোধিতার তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণে ছিলবলেই রবীন্দ্রনাথ যথাসম্ভব নিরাসক্তভাব 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বজায় রেখেছেন এবং খ্যাতিহীনতার স্নিগ্ধ প্রহর অতিক্রম করে যে-মুহূর্তে বাহিরবিশ্ব ও পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয়েছেন, সে-মুহূর্তে কলমের মুখ চেপে ধরেছেন। যখন পাঠকের কৌতূহল চরমে উপনীত হয়েছে, যখন জীবনে 'ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ' হয়ে এসেছে, যখন শিল্পীজীবনের খাসমহলের দরজায় পাঠকের চোখ পড়েছে, তখনি রবীন্দ্রনাথ কলম ছেড়ে দিয়েছেন। এই আফ্‌শোষ জীবনস্মৃতির প্রতি পাঠকের। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে একটি উদাস ব্যাকুল অন্তর্মুখী প্রকৃতিমুগ্ধ কবিত্বমুখ্য মনের পরিচয় পাই। কবি তাঁর রঙমহালের দরজা বাঙালি পাঠকের সামনে খুলে দিলেন না। তথাপি যা পেয়েছি, তাতেই পাঠকমন বলে ওঠে, এ-পাওয়া পরম-প্রাপ্তি।

কবির জীবনচরিত কি সংসারের অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রখ্যাতকীর্তি পুরুষদের জীবনচরিত থেকে ভিন্নতর হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জীবনচরিত মহাপুরুষের এবং কাব্য মহাকবির।...কবি কবিতা যেমন করিয়া করিয়াছেন, জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই ; তাঁহার জীবন কাব্য নহে। যাঁহারা কর্মবীর, তাঁহারা নিজের জীবনকে নিজে সৃজন করেন। তাঁহাদের জীবনের কর্মই তাঁহাদের কাব্য, সেইজন্য তাঁহাদের জীবনী মানুষ ফেলিতে পারে না।...কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্মে, উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করতে পারেন—কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল।

কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে, তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে। দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে, উভয়কে একত্র পাঠ করিলে, জীবন এবং কাব্যের মর্যাদা বেশী করিয়া দেখা যায়। টেনিসনের জীবন সেরূপ নহে।...আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো কবির জীবনচরিত নাই। আমি সেজন্য চিরকৌতূহলী, কিন্তু দুঃখিত নহি।...টেনিসনের কাব্যগত জীবনচরিত একটি লেখা যাইতে পারে—বাস্তবজীবনের পক্ষে তাহা অমূলক, কিন্তু কাব্যজীবনের পক্ষে তাহা সমূলক। কল্পনার সাহায্যে তাহা সত্য করা যাইতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথের কাছে কবির জীবনচরিত তাই অন্য অর্থে প্রতিভাত। কাব্য-গত জীবনচরিত—যা 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ['বঙ্গভাষার লেখক'-এ প্রথম প্রকাশিত]—হয়েছে, তা-ই সত্য, আর সব মিথ্যা। কাব্যই কবির সত্য জীবনচরিত তথা আত্মচরিত।

আর 'জীবনস্মৃতি' ? কবির মুখেই শোনা যাক্ ঃ

"কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে, একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, জীবনবৃত্তান্তের দুই-চারিটি মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু, দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে—সে-রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে চাহিয়াছে ; সুতরাং পটের উপর যে-ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবেনা।

"এই স্মৃতির ভাণ্ডারে অত্যন্ত যথাযথরূপে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু ছবি দেখার একটা নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। যখন পথিক যে-পথটাতে চলিতেছে বা যে-পান্থশালায় বাস করিতেছে, তখন সে-পথ বা সে-পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে ; তখন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ। যখন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে, তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়। জীবনের প্রভাতে যে-সকল শহর এবং মাঠ, নদী এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, অপরাহ্নে বিশ্রামশালায় প্রবেশের

পূর্বে যখন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানো যায়, তখন আসন্ন দিবাবসানের আলোকে সমস্তটা ছবি হইয়া চোখে পড়ে। পিছন ফিরিয়া সেই ছবি দেখার অবসর যখন ঘটিল, সেদিকে একবার যখন তাকাইলাম, তখনই তাহাতে মন নিবিষ্ট হইয়া গেল।" [সূচনা, জীবনস্মৃতি]

সপ্ততিতম জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনে জন্মদিনের প্রতিভাষণে রবীন্দ্রনাথ আপন পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।" [আত্মপরিচয়, চতুর্থ প্রবন্ধ]

আত্মকথা বলতে গিয়ে 'জীবনস্মৃতি'র উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে কবি বলেছেন, "আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটি সত্য নহে।" [আত্মপরিচয়, প্রথম প্রবন্ধ]

কাব্যকথা ও জীবনকথা—দুইকে রবীন্দ্রনাথ একসূত্রে গেঁথেছেন। জীবনস্মৃতি কবির জীবনের বৃত্তান্ত নয়, ইতিহাস নয়, চিত্রশালা। জীবনস্মৃতির আগাগোড়া একটি স্মিত হাসি ও পরিহাসের সুর অনুস্যূত হয়ে আছে। রঙের পর রঙে জীবনপটে কত ছবি ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ চল্লিশ বছরের জীবন থেকে নানা ছবি নির্বাচন করে দেখিয়েছেন। কোনোটা সুখের কোনোটা দুঃখের, কোনোটা বিষাদের—সবটা মিলিয়ে আনন্দের মেলা। এক প্রকৃতিপ্রেমী কবির বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের আনন্দগুঞ্জরণে জীবনস্মৃতি মুখরিত হয়ে আছে।

॥ ২ ॥

উত্তররামচরিত নাটকের বিখ্যাত আলেখ্যদর্শন অংশের কথা এখানে মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথও তা মনে ক'রেছেন। ফেলে-আসা জীবনের প্রতি মমতা কিছু-না-কিছু থাকেই, অহং-এর দাবী অস্বীকার করা যায় না, তথাপি এ ছাড়াই ছবির নিজস্ব একটা মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির চিত্রশালায় সেই মূল্য অর্পণ করে সূচনায় বলেছেন, "নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। এই স্মৃতিচিত্রগুলিও সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী।"

জীবনস্মৃতির আলেখ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হলে বিচিত্র অনুভূতিতে পাঠকমন অভিষিক্ত হয়। সব ছবি একপ্রকার নয়। কোনোটার রঙ উজ্জ্বল, কোনোটার রঙ জ্বলে গেছে, কোনোটা ধূলিধূসরিত, কোনোটা বা বিবর্ণ। ছবিগুলোর ফ্রেম একপ্রকারের নয়। কোনোটা হাসির, কোনোটা কান্নার, কোনোটা বা হাসি-কান্নার আলোছায়ার ফ্রেমে বাঁধানো। সমস্তটা মিলিয়ে এক অখণ্ড ছবি। অতি শৈশব থেকে চল্লিশ বছরের যৌবনকাল পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে এই ছাবর মিছিল চলেছে।

এবার আলেখ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

প্রথমেই যে ছবিটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল অন্দর মহলের ঘাটবাঁধানো পুকুর, তার পূব ধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড এক চীনা বট, দক্ষিণে নারিকেলশ্রেণী। এই ফ্রেমে ছবিটি বাঁধা পড়েছে। চিত্রকর নিজেই বলেছেন,

"গণ্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্তদিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্ব-টুকুও আমার পরিচিত।......কেহ-বা ব্যস্ত,......কাহারো-বা ব্যস্ততার লেশমাত্র নাই।......এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলি সারা বেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।" [ঘর ও বাহির]

একই ম্যুরালে ছবির পর ছবি আসছে, তাতে আলো ও রঙ ক্রমাগতই পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রভাত থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত ছবির গতি।

পরের ছবিটাও মধ্যাহ্নের। মধ্যাহ্নের সঙ্গী বালকের চোখে সেদিন এই ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল :

"দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিতাম—চোখে পড়িত আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেলশ্রেণী ; তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত সিঙ্গির বাগান পল্লীর একটা পুকুর এবং সেই পুকুরের ধারে যে তারা গয়লানী আমাদের দুধ দিত তাহারই গোয়ালঘর ; আরো দূরে দেখা যাইত। তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্নরৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই-সকল অতিদূর বাড়ির ছাদে এক-একটা চিলেকোঠা উঁচু হইয়া থাকিত।......মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারি সুর করিয়া 'চাই, চুড়ি চাই, খেলনা চাই' হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।" [ঘর ও বাহির]

একটী পরিপূর্ণ মধ্যাহ্নের ছবি, প্রতিটি খুঁটিনাটি এতে উপস্থিত। এরপরই একটি সন্ধ্যাচিত্র পাই। অতি অল্প আয়োজনে ছবিটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

"সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চারদিকে আমাদের বসাইয়া সে [ঈশ্বর ভৃত্য] রামায়ণ-মহাভারত শোনাইত।......ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়িকাঠ পর্যন্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত, টিকটিকি দেওয়ালে পোকা ধরিয়া খাইত, চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত, আমরা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম।" [ভৃত্যরাজকতন্ত্র]। অতিক্রান্ত বাল্যের এই সান্ধ্যসভা অঙ্কনগুণে স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

এর পরের ছবিটি বর্ষার। বর্ষাচিত্র জীবনস্মৃতিতে তথা রবীন্দ্রসাহিত্যে বারবার এসেছে। শৈশবের মেঘদূত 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।' তার কথা সূচনায় পাই। পেনেটিতে ছাতুবাবুদের বাগানে ঠাকুর-পরিবারের এক অংশ কিছুদিনের জন্য ছিলেন, বাহিরের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। এই পরিচয়ের আনন্দ ছবিতে অনুস্যূত হয়ে আছে। ছবিটি আশ্চর্য-সুন্দর ল্যাণ্ডস্কেপ :

"প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ার ভাঁটার আসাযাওয়া, সেই কত রকম-রকম নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারাগাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্যাস্ত-কালের অজস্র স্বর্ণশো।ণতপ্লাবন। এক-একদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে ; ওপারের গাছগুলি কালো ; নদীর উপর কালো ছায়া ; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করে ; নদী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলার মধ্যে যা-খুশি-তাই করিয়া বেড়ায়।" [বাহিরে যাত্রা]

জীবনস্মৃতির উল্লেখযোগ্য ছবির মিছিল এবার সুরু হলো। ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ একটি বালকের মনে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করছে, তার একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় এখানে পাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রনাথ উত্তরভারত ভ্রমণে গেছিলেন। কোথায় কলকাতা, কোথায় গঙ্গা, আবার কোথায় দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় !

ডালহৌসিতে নববসন্তের সমারোহ পেরিয়ে বক্রোটায় উপনীত রবীন্দ্রনাথ নির্জন দুপুরে পাহাড়ের তলদেশে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করে বেড়াতেন। এই ভ্রমণের একটি বিরল অভিজ্ঞতাচিত্র এখানে পাই ঃ

"বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা, এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।" [হিমালয়যাত্রা]। আমাদের মনশ্চক্ষে এই ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হিমালয়ের উদার পরিবেশ, উদারতর নির্মল আকাশ, ঘনশীতল বনস্পতি-তলের ছায়া থেকে এবার আমরা কলকাতায় ফিরে আসি। রবীন্দ্রনাথ পুনরায় শৈশবের ছবি এঁকেছেন। এই ছবিও ছায়া-আলোকের সমাবেশে অঙ্কিত। কত আন্তরিক ব্যাকুলতা এই ছবির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এর কৈফিয়ৎ দিয়েই তিনি ছবি এঁকেছেন ঃ

"বাহিরের প্রকৃতি যেমন আমার কাছ হইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও ঠিক তেমনি। সেইজন্য যখন তাহার যেটুকু দেখিতাম আমার চোখে যেন ছবির মতো পড়িত। রাত্রি নটার পর অঘোরমাস্টারের কাছে পড়া শেষ করিয়া বাড়ির ভিতরে শয়ন করিতে চলিয়াছি ; খড়খড়ে-দেওয়া লম্বা

বারান্দাটাতে মিট্‌মিটে লণ্ঠন জ্বলিতেছে, সেই বারান্দা পার হইয়া গোটা চারপাঁচ অন্ধকার সিঁড়ির ধাপ নামিয়া একটি উঠান-ঘেরা অন্তঃপুরের বারান্দায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি, বারান্দার পশ্চিমভাগে পূর্ব-আকাশ হইতে বাঁকা হইয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে, বারান্দার অপর অংশগুলি অন্ধকার, সেই একটুখানি জ্যোৎস্নায় বাড়ীর দাসীরা পাশাপাশি পা মেলিয়া বসিয়া উরুর উপর প্রদীপের সলিতা পাকাইতেছে এবং মৃদুস্বরে আপনাদের দেশের কথা বলাবলি করিতেছে—এমন কত ছবি মনের মধ্যে একেবারে আঁকা হইয়া রহিয়াছে। তারপরে রাত্রে আহার সারিয়া বাহিরের বারান্দায় জল দিয়া পা ধুইয়া একটা মস্ত বিছানায় আমরা তিনজনে শুইয়া পড়িতাম—শংকরী কিম্বা প্যারী কিম্বা তিনকড়ি আসিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া তেপান্তর-মাঠের উপর দিয়া রাজপুত্রের ভ্রমণের কথা বলিত, সে-কাহিনী শেষ হইয়া গেলে শয্যাতল নীরব হইয়া যাইত ; দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া ক্ষীণালোকে দেখিতাম, দেয়ালের উপর হইতে মাঝে মাঝে চুনকাম খসিয়া গিয়া কালোয় সাদায় নানাপ্রকার রেখাপাত হইয়াছে ; সেই রেখাগুলি হইতে আমি মনে মনে বহুবিধ অদ্ভুত ছবি উদ্‌ভাবন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম ; তারপর অর্ধরাত্রে কোনো দিন আধঘুমে শুনিতে পাইতাম, অতিবৃদ্ধ স্বরূপসর্দার উচ্চস্বরে হাঁক দিতে দিতে এক বারান্দা হইতে আর এক বারান্দায় চলিয়া যাইতেছে।” [প্রত্যাবর্তন]

ভেবে দেখলে আশ্চর্য হতে হয় যে, পঞ্চাশ বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে যিনি পদার্পণ করেছেন, সংসারে কত অভিজ্ঞতার নদী পেরিয়ে চলেছেন, তিনি সেই অতিক্রান্ত বাল্যের এই ছবিটিকে এত সত্য জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন কী করে! এই ছবিটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, খুঁটিনাটি সবই ঠিক ঠিক জায়গায় আছে ; আলো-ছায়ার অতি নিপুণ ব্যবহার হয়েছে ; লণ্ঠনের আলো ও জ্যোৎস্নার আলোয় কোথাও ছায়া, কোথাও বা অন্ধকার, আবার কোথাও ম্লান আলো। সবটা মিলিয়ে পরিপূর্ণ ছবি।

॥ ৩ ॥

এরপর পুনরায় পট পরিবর্তন হয়েছে। আমেদাবাদ ও বোম্বাই, তারপর বিলাতে—ব্রাইটন, লণ্ডন, ডেভনশায়ার। আমেদাবাদে সবরমতী নদীতীরে শাহিবাগে জজসাহেবের আবাসস্থল বাদশাহী আমলের প্রাসাদ পরবর্তীকালে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের পটভূমিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া বোম্বাই বা বিলাতের প্রকৃতিদৃশ্য রবীন্দ্রসাহিত্যে স্থান পায় নি, জীবনস্মৃতিতেও কোনো ভালো ছবি নেই। বরং দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার আরম্ভপথ থেকে ফিরে আসার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাময়িক আবাসস্থল চন্দননগরে গঙ্গাতীরে মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির ও সুন্দরী গঙ্গার ছবিটি উজ্জ্বল রঙে অঙ্কিত হয়েছে।

এই বাগানবাড়ি ও গঙ্গার ছবিটি পরিপূর্ণ আনন্দের ছবি। বর্ণভাণ্ড নিঃশেষ করে রবীন্দ্রনাথ এই ছবিতে রঙের 'পর রঙ চড়িয়েছেন। বর্ণনার বাহক যে গদ্যভাষা তাতেই এই আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ধরা পড়েছে :

"আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্নপরিবেষণ হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানটার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীরমন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল।" [গঙ্গাতীর]

এই স্বীকৃতি কবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কাব্যকীর্তি বোঝবার পক্ষে খুবই সহায়ক। সহস্র ব্যাখ্যায় যা না হয়, এই আনন্দময় স্বীকৃতিতে তা হয়েছে। আমরা এক মুহূর্তেই প্রকৃতিপ্রেমী কবিস্বরূপটি উপলব্ধি করতে পারি, রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম উৎসটি চিনে নিতে পারি।

কবির চোখে এই বর্ণসমৃদ্ধ উজ্জ্বল করুণ ছবিটি দেখি :

"আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

কখনো-বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়ামযন্ত্র-যোগে বিদ্যাপতির 'ভরাবাদর মাহভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম; কখনো-বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম, পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিকঝিক্ করিতেছে।" [তদেব]

এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। গঙ্গাতীরের এই পালা সন্ধ্যাসংগীতের পালা, রবীন্দ্রকাব্য তখন স্বকীয়তা লাভের পথে এগিয়ে চলেছে। সন্ধ্যাসংগীতের 'গান আরম্ভ'-এ গঙ্গাতীরের আকাশের ছবি পাই।

ঠিক এর পরেই প্রভাতসংগীতের পালা। সেখানেও উদ্বোধনের লগ্নটি সন্ধ্যার—জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদে দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভা মিশে আসন্ন সন্ধ্যা মনোহর হয়ে উঠেছিল, পরিচিত জগতও মনোহর হয়ে উঠেছিল। তারপর সদর স্ট্রীটের বাড়িতে এক প্রভাতে সূর্যোদয়ের লগ্নে কবিচিত্তে নব প্রেরণার জাগরণ (দ্রঃ, 'প্রভাতসংগীত' অধ্যায়)।

॥ ৪ ॥

জীবনস্মৃতির চিত্রশালায় প্রবেশ করলে একটা সত্য অনুভব করা যায় যে, পর্বত (কি ডালহৌসি, কি দার্জিলিং) বা সমুদ্র (কি ডেভনশায়ার, কি পুরী) রবীন্দ্রনাথকে খুব বেশী অভিভূত করে নি, রবীন্দ্রকাব্যে এরা খুব বেশি ঠাঁই পায় নি। বিপরীতক্রমে, নদী (সাবরমতী, গঙ্গা, পদ্মা, কালানদী), সমতল-ভূমি (গাজিপুর, বোলপুর, পদ্মাচর) এবং সুনীল আকাশ কবিকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছে, রবীন্দ্রসাহিত্যে গভীর রেখাপাত করেছে। সেইসঙ্গে প্রভাত,

মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা কবিকে আকর্ষণ করেছে। ঋতুচক্রের মধ্যে বর্ষাঋতু সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত। জীবনস্মৃতিতেও তাই—বর্ষাবর্ণনায় স্মৃতি-বিহারী কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন।

জীবনস্মৃতিতে এর পরের গুরুত্বপূর্ণ ছবিটি হলো কর্ণাটক ভূমির শৈলবেষ্টিত নিভৃত কারোয়ার বন্দরের ছবি। এই ছবিটিতে ছায়ান্ধকারের নিপুণ বর্ণনা পাই, মনে হয় একজন সুদক্ষ ল্যাণ্ডস্কেপ-চিত্রী ছবি এঁকেছেন ঃ

"প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড়ো বড়ো ঝাউগাছের অরণ্য ; সেই অরণ্যের এক সীমায় কালানদী নামে এক ক্ষুদ্র নদী তাহার দুই গিরিবন্ধুর উপকূল রেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। মনে আছে, একদিন শুক্লপক্ষের গোধূলিতে একটি ছোট নৌকায় করিয়া আমরা কালানদী বাহিয়া উজাইয়া চলিয়াছিলাম। এক জায়গায় তীরে নামিয়া শিবাজির একটি প্রাচীন গিরিদুর্গ দেখিয়া আবার নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। নিস্তব্ধ বন, পাহাড় এবং এই নির্জন সংকীর্ণ নদীর স্রোতটির উপর জ্যোৎস্নারাত্রি ধ্যানাসনে বসিয়া চন্দ্রলোকের জাদুমন্ত্র পড়িয়া দিল।···ফিরিবার সময় ভাঁটিতে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া গেল।·········

সমুদ্রের মোহনার কাছে আসিয়া পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল। সেইখানে নৌকা হইতে নামিয়া বালুতটের উপর দিয়া হাঁটিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। তখন নিশীথরাত্রি, সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, ঝাউবনের নিয়তমর্মরিত চাঞ্চল্য একেবারে থামিয়া গিয়াছে, সুদূরবিস্তৃত বালুকারাশির প্রান্তে তরুশ্রেণীর ছায়াপুঞ্জ নিস্পন্দ, দিক্‌চক্রবালে নীলাভ শৈলমালা পাণ্ডুরনীল আকাশতলে নিমগ্ন। এই উদার শুভ্রতা এবং নিবিড় স্তব্ধতার মধ্য দিয়া আমরা কয়েকটি মানুষ কালো ছায়া ফেলিয়া নীরবে চলিতে লাগিলাম। বাড়িতে যখন পৌঁছিলাম তখন ঘুমের চেয়েও কোন্ গভীরতার মধ্যে আমার ঘুম ডুবিয়া গেল।" [কারোয়ার]

সমস্ত ছবিটা অখণ্ড স্বপ্নের মতো, লঘু তুলির স্পর্শে লঘুতর বর্ণপ্রলেপে এই স্তব্ধ শর্বরী আশ্চর্য ভাষারূপ লাভ করেছে।

এবার আমরা জীবনস্মৃতির শেষ অধ্যায়ে উপনীত হয়েছি। আলেখ্য দর্শনের সূচনায় বর্ষা ঋতু, সমাপ্তিতেও তা-ই। বাল্যের দিনগুলিতে বর্ষার আধিপত্য। প্রথম যৌবনে শরতের রাজত্ব ('কড়ি ও কোমল'), তারপরই পুনর্বার বর্ষার প্রতাপ ('মানসী')। শ্রাবণের গভীর রাত্রির অবিশ্রান্ত ধারাপতনধ্বনি আর আশ্বিনের সোনা-গলানো রৌদ্রে স্নাত প্রভাতে যোগিয়া

সুরের গুন্‌গুনানি ঃ এই দুয়ে মিলে এক অখণ্ড জীবনসংগীত। সে সংগীতের অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ।

বাল্যকালের বর্ষা ও প্রথম যৌবনের শরতের নিবিড়তা ও চাঞ্চল্য, গভীরতা ও জীবনান্দোলন, ব্যাকুলতা ও প্রফুল্লতা—সবটা মিলিয়ে এক জীবনসুরের প্রবর্তনা। এই সুরেই রবীন্দ্রকাব্য বাঁধা হয়েছে। জীবনস্মৃতি সেই সুরের ধারক। তাই রবীন্দ্রজীবনে ও সাহিত্যে এর মূল্য এত অধিক।

স্মৃতির ঘরে সন্ধান নিতে গিয়ে একদিন রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিচিত্ররাজি দেখে মুগ্ধ ও আবিষ্ট হয়েছিলেন, ছবি দেখার নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। জীবনের অর্ধপথ অতিক্রম করে এসে ছবি দেখার অবসর কবি পেয়েছিলেন। জীবনস্মৃতি সেই ক্ষণিক অবসরে আলেখ্যদর্শনের ফল। এই স্মৃতিচিত্রগুলি সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্য-রসোপভোগের পথে কবি পাঠককে প্রবৃত্ত করতে চেয়েছেন। জীবনস্মৃতির এই চিত্রশালায় বাঙালি পাঠক মুগ্ধ নয়নে আলেখ্যদর্শন করে ধন্য হয়েছে।

টেকোমাথা বুড়ো গল্প বলছে :

"তারপর ওদিকে বড়মন্ত্রী তো রাজকন্যার গুলিসুতো খেয়ে ফেলেছে। কেউ কিছু জানে না। ওদিকে রাক্ষসটা করেছে কি, ঘুমুতে ঘুমুতে হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ বলে হুড়মুড় করে খাট থেকে পড়ে গিয়েছে। অমনই ঢাক ঢোল সানাই কাঁসি লোক লস্কর সেপাই পল্টন হৈ হৈ রৈ রৈ মার-মার কাট-কাট —এর মধ্যে হঠাৎ রাজা বলে উঠলেন, পক্ষিরাজ যদি হবে, তা হলে ল্যাজ নেই কেন? শুনে পাত্র মিত্র ডাক্তার মোক্তার আক্কেল মক্কেল সবাই বললে, ভাল কথা! ল্যাজ কি হল? কেউ তার জবাব দিতে পারে না। সব সুরসুর করে পালাতে লাগল।"

আশা করি রসিক পাঠককে বলে দিতে হবে না যে এই অংশটি স্বনামখ্যাত সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' থেকে গৃহীত হয়েছে। এই স্বপ্নমঙ্গলের কাহিনী রচনা করে সুকুমার রায় অবিনাশী গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। জাগ্রত বাস্তব জগতের বিচারে এ কাহিনী উদ্ভট, খাপছাড়া, বিশুদ্ধ গাঁজা মাত্র। কিন্তু না, এ হল প্রতিভার জাগ্রত স্বপ্নের ফসল। সুকুমার রায় সেই বিরল প্রতিভা।

বিখ্যাত অঙ্কবিদ্ চার্লস ডজ্‌সনের কথা আমরা মনে রাখি না, কিন্তু 'লুই ক্যারল' এই ছদ্মনামে যে অপূর্ব খাপছাড়া গ্রন্থ—'অ্যালিস ইন্ ওঅণ্ডার-লাণ্ড' তিনি রচনা করেছেন, তা অমর হয়ে আছে ও থাকবে। জগতের কোটি কোটি শিশু এই বই পড়ে আনন্দ পেয়েছে ও পাবে। এবং সম্ভবতঃ শিশুদের জনকজননীরাও এই বই পড়ে আনন্দ পান।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, পরশুরাম এই জাতীয় উদ্ভট রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইংরেজীতে লুই ক্যারল, এডোঅর্ড লীয়র, ইউজিন ফীল্ড, অগডেন ন্যাশ 'ননসেন্স' কবিতা রচনা করেছেন। উদ্ভট স্বপ্নমঙ্গলের কথা ও এলোমেলো কবিতা রচনা করা সোজা নয়, তার জন্য প্রয়োজন গভীর কল্পনা, অবাধ উৎকল্পনা ও মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞতা। ইমাজিনেশন ও ফ্যান্সি, দুয়ের উপরই দখল চাই। অতিশিষ্ট অতিভদ্র নিয়মশাসিত প্রথাবদ্ধ সংসারের পেষণে যখন মন বিদ্রোহ করতে চায় খেপে যেতে ইচ্ছে করে,

তখন এই ননসেন্স ও ফ্যাণ্টাসর জগতে, খাপছাড়া ও উৎকল্পনার রাজ্যে পালিয়ে যাবার তীব্র বাসনা জাগে।

এই স্বপ্নমঙ্গলের কথায় রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল সমগ্র জীবনব্যাপী। 'হিং টিং ছট' ('সোনার তরী') থেকে 'গল্পসল্প' তার পরিচয়স্থল।

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনার মধ্যে 'সে' একটি আশ্চর্য রচনা। 'সে' প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সর্ববিধ সৃষ্টিতে তাঁর সমগ্র জীবনে অস্বীকৃত ছায়াময় জগতের আভাস ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে, গদ্য-কবিতায়, 'তিনসঙ্গী' গল্পগ্রন্থে স্থূল অসুন্দর ভয়ঙ্কর অন্ধকার ছায়ালোকের ও অবচেতনের স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। ছবিতে যে অ-রূপ জগতের রূপ ফুটে উঠেছে, তা এত-দিনের রবীন্দ্র-সাহিত্যে অস্বীকৃত ছিল। আর 'তিনসঙ্গী' গল্পে বিজ্ঞান-উপাদানের সমাবেশ ও বিজ্ঞান-মনস্কতা লক্ষ্য করা যায়। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) লেখেন ও বিজ্ঞানকর্মীদের সান্নিধ্যে আসেন। 'সে' গ্রন্থে বিজ্ঞান-মনস্কতা ও খেয়ালিপনা দুই-ই আছে। 'সে' গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেছেন বিজ্ঞানী-অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে। এটিও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

॥ ২ ॥

উৎসর্গ-পত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'সে' গ্রন্থের পরিচয় দিয়েছেন। সেটি আলোচনা করলে এর স্বরূপ বুঝতে সহায়তা হবে বলে আমার ধারণা।

কবি বলেছেন ঃ

'আমারো খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নিরুদ্দেশে
বাউলের বেশে।
যেথা আছে খ্যাতহীন পাড়া।
সেথায় সে মুক্তি পায় সমাজ-হারানো লক্ষ্মীছাড়া।

যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,
দিলেম উজাড় করি ঝুলি।
লও যদি লও তুলি,
রাখো ফেলো যাহা ইচ্ছা তাই—
কোনো দায় নাই।'

মনের গহন থেকে ভেসে-আসা খেয়াল-ছবির মিছিল 'সে' গ্রন্থে দেখা গিয়েছে। ফসল কাটার পর শূন্য মাঠে যে তুচ্ছ আগাছার ফুল ফোটে, রবীন্দ্রনাথ 'সে' গ্রন্থকে তার সঙ্গে উপমা দিয়েছেন। ফ্যাণ্টাসির ধর্ম তিনি এর উপরে আরোপ করেছেন, নিরুদ্দেশ বাউলের বেশে এ ভেসে বেড়ায়। খেয়ালা লঘু কল্পনার উদ্দেশ্যহীন খাপছাড়া সঞ্চরণ বলেই একে তিনি মনে করেন।

'সে' কি কেবল ছোটদের জন্য লিখিত? 'সে' পড়ে তা মনে হয় না। শিশুর অবাধ বিস্ময় ও কৌতূহলের খোরাক 'সে' জোগায়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে যে বিজ্ঞান-মনস্কতা 'সে' গ্রন্থে আছে, তা সম্পূর্ণরূপে শিশুবোধ্য নয়। শিশুর কল্পনা-সীমান্ত ছাড়িয়ে গেছে 'সে'। বিশ্বসৃষ্টিকে অবলম্বন করে শেষের দিকের কয়েকটি অধ্যায়ে যে বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে, তা প্রতিভার স্পর্শে অ-সাধারণত্বের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

॥ ৩ ॥

'সে' গ্রন্থের প্রধান চরিত্র তিনটি—'আমি' (গল্পকথক), 'তুমি' গল্পের শ্রোতা অর্থাৎ পুপুদিদি) আর 'সে' (অনামিকতার আবরণে আবৃত)। 'সে' মানুষটি সম্পূর্ণ খেয়ালী, বলা যায় উদ্ভট ও খাপছাড়া। একে নিয়েই যত গল্প। তার চরিত্রে যত হাস্যকর উপাদান আছে বা থাকা উচিত ছিল, সে-সবকে নিয়ে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য গল্প 'আমি' খাড়া করেছেন।

'সে' গ্রন্থের সূচনায় প্রথম পরিচ্ছেদে গল্পকথক 'আমি' মানুষের অন্যতম আদিম প্রবৃত্তি—গল্প শোনার প্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। গল্পরসের সঙ্গে এখানে মিলেছে উদ্ভটরস আর বিজ্ঞানরস; সবটা মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি। 'সে' গ্রন্থ রচনার কৈফিয়ত দিয়েছেন এই বলে, "অনেক গল্প শুরু হয়েছে এই ব'লে যে, এক যে ছিল রাজা। আমি আরম্ভ ক'রে দিলুম, এক যে আছে

মানুষ। তার পরে লোকে যাকে বলে গপ্‌পো, এতে তারও কোনো আঁচ নেই। সে মানুষ ঘোড়ায় চ'ড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল না। একদিন রাত্রি দশটার পর এল আমার ঘরে। আমি বই পড়ছিলুম। সে বললে, দাদা, খিদে পেয়েছে।"

এই ভূমিকা থেকেই বোঝা গেল এই গল্প বাঁধা-ধরা পথে চলবে না। 'সে' পরিচিত সংসারের লোক, তার খিদে পায় এবং খায় ভাল। এমন একটি ঘোরতর সংসারী চরিত্রকে নিয়েই যত কাণ্ড।

প্রথম থেকে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কাহিনী 'সে'-র টানে চলে এসেছে। 'সে'-র নানা কীর্তিকলাপের সরস বর্ণনা পাই। 'আমি' ও 'পুপুদিদি'— দুজনে মিলে 'সে'-কে নিয়ে কত মজাই করেছেন। গোড়াতেই লেখক বলেছেন, এ রূপকথা নয়। "এ তো রাজপুত্তুর নয়, এ হল মানুষ, এ খায়-দায় ঘুমোয়, আপিসে যায়, সিনেমা দেখবারও শখ আছে। দিনের পর দিন যা সবাই করছে তাই এর গল্প।···তার পরে তারপরে এই রকমই আরও কত কী—বড়োবাজার থেকে বহুবাজার, বহুবাজার থেকে নিমতলা।"

গল্পকথক বলেছেন, "আমাদের এই 'সে' পদার্থটি ক্ষণজন্মা বটে; এমনতরো কোটিকে গোটিক মেলে। মিথ্যে কথা বানাতে অপ্রতিদ্বন্দী প্রতিভা। আমার আজগুবি গল্পের এত বড়ো উত্তর-সাধক ওস্তাদ বহু ভাগ্যে জুটেছে। গল্প-প্রশ্নের উত্তরপাড়ার এই যে মানুষ, মাঝে মাঝে একে পুপুদিদির কাছে এনে হাজির করি—দেখে তার বড়ো চোখ আরও বড়ো হয়ে ওঠে। খুশি হয়ে বাজার থেকে গরম জিলিপি এনে খাইয়ে দেয়।—লোকটা অসম্ভব জিলিপি ভালোবাসে, আর ভালোবাসে শিকদার পাড়া গলির চম্‌চম্। পুপুদিদি জিগেস করে, তোমার বাড়ি কোথায়। ও বলে, কোন্‌নগরে, প্রশ্নচিহ্নের গলিতে।"

এই অনামিক অথচ অতি-প্রত্যক্ষ 'পয়লা নম্বরের মানুষ' 'সে'-কে নিয়েই যত গল্পের সূচনা। হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস, শিবাশোধন সমিতির রিপোর্ট, গেছোবাবা, সে-র বরযাত্রা ও বিয়ে, তাস্‌মানিয়ার শ্রীযুক্ত কোজুমাচুকূ ও শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুস্কুনা, আধুনিক বাঘেদের প্রগতি-আন্দোলন, সে-র চেহারাহারানো, স্বামীস্বত্বদাবিতে পাতুখুড়োর গিন্নির মামলা, সে-র মগজে বাঁদরের মগজ, খরগোস-ঘণ্টাকর্ণ, শুক-সারীর দ্বন্দ্ব—পর পর এই এগারোটি কাহিনীতে গল্পকথক আমাদের ফ্যাণ্টাসির রাজ্যে নিয়ে গেছেন। এর মধ্যে যোগসূত্র আদি ও অকৃত্রিম 'সে'। তাই কখনই বাস্তব জগৎ থেকে সম্পর্ক

বিচ্ছিন্ন হয় না। 'সে' এই জগতেরই লোক, তাকে নিয়ে রঙ্গ করতে করতে গল্পকথক স্ফূর্তিতে গাঁজার গল্প রচনা করেছেন। শিশুর জগতে 'সে' এক নোতুন আনন্দের বার্তাবহ হয়ে এসেছে। পুপেদিদির 'পরে গল্পগুলির প্রতিক্রিয়াতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

এরপর দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত শেষাংশে বিজ্ঞান-মনস্কতার পরিচয় নাই। এখানে অলৌকিক রসের সঙ্গে মিশেছে বিজ্ঞান কৌতূহল। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বিশ্বসৃষ্টির বিজ্ঞান-কাহিনীকে সুর-বেসুরের দ্বন্দ্ব বর্ণনচ্ছলে গল্পকথক উপস্থিত করেছেন। 'পত্রপুটে'র 'পৃথিবী' কবিতায় সৃষ্টিকাহিনীর যে অপরূপ কবিতামূর্তি, এখানে তারই অলৌকিক ফ্যাণ্টাসিপ্রতিমা। শেষে পাই কবির নিজস্ব বক্তব্য: "আমার মতটা বলি। দুঃশাসনের আস্ফালনটা পৌরুষ নয়, একেবারে উল্টো। আজ পর্যন্ত পুরুষই সৃষ্টি করেছে সুন্দর, লড়াই করেছে বেসুরের সঙ্গে। অসুর সেই পরিমাণেই জোরের ভান করে যে পরিমাণে পুরুষ হয় কাপুরুষ। আজ পৃথিবীতে তারই প্রমাণ পাচ্ছি।" শেষ মন্তব্যটি প্রফেটের উক্তি বলে মনে করা যায়। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে 'অধ্যাপন-সরোবরের গভীর জলের মাছ' মাস্টারমশাইকে উপলক্ষ করে কথক সৃষ্টিকাহিনী বর্ণনা করেছেন—এবার জীবের জন্ম ও বিবর্তনের পালা—মনের সঙ্গে মাংসের ঠেলাঠেলি মারামারি—মনোবাহী মানুষ সৃষ্টির শেষতম অধ্যায়। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে কিশোর সুকুমারকে কেন্দ্র করে গল্পের বুনুনি—জীবের বিবর্তনের কথা এল স্বপ্নবর্ণনার মাধ্যমে—গাছপালা নদীর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে।

গল্পের সমাপ্তি হয়েছে সুকুমারের বিদায়পত্রে। সে লিখেছে: "য়ুরোপে চন্দ্রলোকে যাবার আয়োজন চলেছে। যদি সুবিধা পাই যাত্রীর দলে আমিও নাম লেখাব। আপাতত পৃথিবীর আকাশ-প্রদক্ষিণে হাত পাকিয়ে নিতে চাই।... ছেলেবেলা থেকে অকারণে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার অভ্যাস। ঐ আকাশটা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি ইচ্ছে দিয়ে পূর্ণ। এই বিলীয়মান ইচ্ছেগুলো বিশ্বসৃষ্টির কোন্ কাজে লাগে কী জানি। বেড়াক উড়ে আমার দীর্ঘনিশ্বাসে উৎসারিত ইচ্ছেগুলো সেই আকাশেই যে আকাশে আজ আমি উড়তে চলেছি।"

'বনবাণী' ও 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের রচয়িতাকে এখানে চিনে নিতে পারি। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পরিচ্ছেদ কাব্যরসে ও গভীর ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ, বিজ্ঞান-

মনস্কতায় ও খেয়ালে পরিপূর্ণ। প্রতিভার লীলার এক অভিনব পরিচয়স্থল হয়ে রইল 'সে' গ্রন্থ।

॥ ৪ ॥

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে এই গ্রন্থের গভীর যোগ রয়েছে। 'সে' রচনার পূর্বেই বিদেশে রবীন্দ্রচিত্রের প্রদর্শনী হয়েছে ও বিদেশী চিত্ররসিকদের সমাদর লাভ করেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য মূলতঃ আলোর জগৎ, রবীন্দ্র-চিত্র অন্ধকারের জগৎ। সৃষ্টিসূচনায় যে অন্ধকার ছিল, তার বিবরণ 'সে' গ্রন্থে কেবল রঙে নয়, রেখায় ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রকৃত রেখাচিত্রগুলি 'সে'-র অন্যতম আকর্ষণ। মলাটের রঙিন পেনসিল ড্রয়িং ; 'সে', 'পাল্লারাম', ও 'পুপু'—জলরঙে আঁকা এই তিনটি ছবি এবং বহুসংখ্যক পেনসিল-ড্রয়িং দেখলে আর সন্দেহ থাকে না যে অন্ধকারের জগৎ এখানে কবির নিকট সমাদৃত হয়েছে। বিশেষ করে এতে যে-সব পশুর ছবি আঁকা হয়েছে সেগুলি যে রকম প্রথাচ্যুত দুঃসাহসিক কল্পনা-নির্ভর, তা রবীন্দ্রনাথের এক অন্য পরিচয় বহন করে। 'গাণ্ডিসাঙ্‌তুং', 'গেছো বাবা', 'ঘণ্টাকর্ণ', 'হিংস্রজাতের ঘণ্টাকর্ণ', 'জিববেরকরা কাঁটাওয়ালা', 'পাতুখুড়োর গিন্নি', 'শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুস্কুনা', 'পাঁড়েজি', 'স্মৃতিরত্নমশায়', 'কনে-দেখা মাঝরাত্তিরের অন্ধকারে' প্রভৃতি ড্রয়িংগুলি এর প্রমাণ।

গল্পে নোতুন পরীক্ষা : 'তিন সঙ্গী'

রবীন্দ্রনাথের গল্পসাহিত্যে ছয়টি পর্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, সন্ধ্যাসংগীত থেকে ছবি ও গানের কালে রচিত চারটি গল্প [ভিখারিণী, ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, মুকুট], তখন লেখকের বয়স ষোল থেকে চব্বিশ। দ্বিতীয় পর্ব, স্বল্পকালস্থায়ী হিতবাদীর যুগে রচিত ছয়টি গল্প [দেনাপাওনা, পোস্টমাস্টার গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, তারাপ্রসন্নের কীর্তি]। লেখকের বয়স তিরিশ। তৃতীয় পর্ব, সাধনার যুগ বা মানসী-সোনার তরী, চিত্রার যুগ, এর পটভূমি পদ্মা। লেখকের বয়স তিরিশ থেকে চৌত্রিশ। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি এই পর্বেই রচিত হয়েছে। এই পর্বে রচিত গল্পের সংখ্যা আটত্রিশ। চতুর্থ পর্ব ভারতীয় যুগ, লেখকের বয়স ছত্রিশ থেকে পঞ্চাশ, গল্পের সংখ্যা তেইশ। এর পর পঞ্চম পর্ব, সবুজপত্রের যুগ, লেখকের বয়স বাহান্ন থেকে ছাপান্ন। এই পর্বের গল্পে বিদ্রোহের সুর লক্ষ্য করা গেল, [হালদারগোষ্ঠী, স্ত্রীর পত্র, ভাইফোঁটা, পয়লানম্বর—তার পরিচয়স্থল]। ষষ্ঠ ও শেষ পর্ব—'তিনসঙ্গী', অশীতিস্পৃষ্ট লেখকের হাতে সৃষ্ট অতিশয়-স্বাতন্ত্র্যধর্মী তিনটি অ-সাধারণ গল্প [রবিবার, শেষকথা, ল্যাবরেটরি]।

'তিনসঙ্গী'র রচয়িতা ও 'গল্পগুচ্ছে'র রচয়িতার পরিচয় এক নয়। গল্পগুচ্ছ যিনি রচনা করেছেন তাঁকেই আমরা গল্পকার রবীন্দ্রনাথ বলে গ্রহণ করেছি। তিনি প্রকৃতিপ্রেমী লিরিক কবি। তিনি মানবমনের কোমল অনুভূতিনিচয়ের নিপুণ রূপকার। 'শাস্তি' গল্পের মতো ব্যতিক্রম বাদ দিলে পদ্মালালিত ভূখণ্ডের সাধারণ মানুষের ছোট সুখ দুঃখই সেদিনের গল্পের একমাত্র প্রেরণা। এমনকি 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের সবুজপত্রায় বিদ্রোহী যৌবনের উচ্চ আত্মঘোষণাও রবীন্দ্র-গল্পসাহিত্যে সুলভ নয়। গল্পগুচ্ছের তলে তলে একটি করুণা ও সমবেদনার ফল্গু প্রবহমান। গল্পগুচ্ছের লেখক-বিধাতা-সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার প্রায় সকলেই কিশোর-কিশোরী, তাদের প্রতি লেখক-বিধাতার স্নেহ-বাৎসল্যই প্রকাশ পেয়েছে। সাধনা-যুগের গল্প সম্পর্কে কবির স্বীকারোক্তিতেই এই লিরিকধর্মিতার প্রমাণ পাই। কবি বলেছেন : "একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে সকল দৃশ্য লোক ও ঘটনা কল্পনা করছি, তারই চারিদিকে এই রৌদ্র, বৃষ্টি, নদী-স্রোত, এবং নদী-

তীরের শর-বন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্যে সজীব করে তুলেছে।" (ছিন্নপত্র, ২৮ জুন, ১৮৯৫)। সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ সংসারের ভালবাসা আর নীলাকাশের চন্দ্রাতপতলে উদাস পদ্মাপ্রবাহের ফ্রেমে গল্পগুচ্ছের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি বিধৃত হয়েছে। গিরিবালা, উমা, মিনি, মৃন্ময়ী, ফটিক সুভা, রতন, খোকাবাবু সেদিনের গল্পরাজ্যের নায়ক-নায়িকা, তারা কৈশোর উত্তীর্ণ হয়নি। সেদিন কবির মনে হয়েছিল, "যতই একলা আপনমনে নদীর উপরে কিম্বা পাড়াগাঁয়ে কোনো খোলা জায়গায় থাকা যায়, ততই প্রতিদিন পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, সহজভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না।" (ছিন্নপত্র, ১৬ জুন, ১৮৯২)। তাই এইসব গল্পের মূল কথা শৈশবের সরলতা ও পবিত্রতা, প্রকৃতির কোমলতা ও মাধুর্য।

সবুজপত্রের পর্বে—বলাকা, ফাল্গুনী, পলাতকা রচনাকালে আমরা যে গল্পগুলি পাই, তাদের সুর নোতুন। সে সুর বিদ্রোহের, নবীন যৌবনের। নারীকে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিতা হতে দেবার আহ্বান শোনা গেল। হালদারগোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, অপরিচিতা, পয়লানম্বর, তপস্বিনী—এই সাতটি গল্পের সুর ব্যঙ্গের, সমালোচনার, বিদ্রোহের। প্রকৃতিপ্রেমমুগ্ধতার দিন গল্পে এখন অবসিত, নারীর মূল্যবোধ ও যৌবনের আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনার সঙ্গে অচল সমাজের সংঘর্ষ এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। পদ্মাপ্রকৃতির পরিবর্তে এসেছে নাগরিক পরিবেশ, হৃদয়াবেগের জায়গা দখল করেছ বিচার-বিশ্লেষণ, কোমল কাব্যধর্মী গদ্যের পরিবর্তে এসেছে খরধার বাকচাতুর্য, কিশোরী মৃন্ময়ী-গিরিবালা উমার স্থানে এসেছ পরিণতবয়স্কা নারী মৃণাল (স্ত্রীর পত্র), অনিলা (পয়লা-নম্বর)। অভ্যাসের অন্ধকার পেরিয়ে মিথ্যা দাসত্বমোহের খোলস ফেলে নারী তার আপন মূল্য অধিকারের জন্য খোলা আকাশের নীচে নীল সমুদ্রের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ আর মেজো-বৌ নেই, তার স্থানে এসেছে স্পর্ধিতা মৃণাল। আর এদের সকলের চেয়ে অগ্রবর্তিনীরূপে দেখা দিল সোহিনী (ল্যাবরেটরী : তিন সঙ্গী)।

গল্পগুচ্ছের অপর আকর্ষণ তার অতিপ্রাকৃত-রস। সে রসের আধারে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গল্প রচনা করেছেন—কঙ্কাল, ক্ষুধিত পাষাণ, মণিহারা, মাস্টার-মশাই। কিন্তু প্রকৃত-রস ও অতিপ্রাকৃত রস—দুয়েরই দিন আজ অবসিত। সবুজপত্রের যুগে এসেছে বাস্তবচেতনা, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, নাগরিক

পরিবেশ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়ঘোষণা, প্রখর ভাষা, প্রখরতর বুদ্ধিযোগ। এর পরের ধাপ 'তিন সঙ্গী'।

॥ ২ ॥

'তিন সঙ্গী' প্রকাশিত হয় যখন তখন রবীন্দ্রনাথ আশী বছরকে স্পর্শ করেছেন (১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ)। এখানে বিজ্ঞানবুদ্ধি ও রিয়ালিজমের জয় ঘোষিত হয়েছে।

'তিন সঙ্গী'তে বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রতি যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তা প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বিষয়ে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য : "তিন সঙ্গী বইখানির তিনটি গল্পেরই প্রধান উপজীব্য বিজ্ঞানসাধনা, প্রধান ব্যক্তিরা সবাই বৈজ্ঞানিক। এমন কি আর্টিষ্ট অভীককুমারকেও বৈজ্ঞানিক বলিতে বাধা নাই। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তাহার আসক্তির জন্য একথা বলিতেছি না, জীবনের প্রতি তাহার নিরাসক্ত, নিরপেক্ষ, কর্মফলে আকাঙ্ক্ষাহীন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি—তাহাকে শিল্পের বৈজ্ঞানিক বলা যাইতে পারে। শেষ কথা গল্পের নবীনমাধব ও অধ্যাপক দুজনেই বৈজ্ঞানিক। ল্যাবরেটরি গল্পটার আগাগোড়াই বৈজ্ঞানিকতায় পূর্ণ। সোহিনী নিজে বৈজ্ঞানিক না হইয়াও বিজ্ঞানের উজ্জ্বল দীপটির চারিদিকে মুগ্ধ মক্ষিকার মতো ঘুরিয়া মরিয়াছে। 'তিন সঙ্গী'তে বৈজ্ঞানিকতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই আকর্ষণের কারণ কি? ১৩৪৪ সালে 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তিন সঙ্গীর গল্পগুলি ১৩৪৬ সাল হইতে ১৩৪৭ সালের মধ্যে লিখিত। 'বিশ্বপরিচয়' লেখা শেষ হইয়া গেলেও বৈজ্ঞানিক আবহাওয়াটা কবির মনে সক্রিয় ছিল। তাহারই রূপান্তর কি 'তিন সঙ্গী'র গল্পগুলি? বিশ্বপরিচয়ে যাহা নির্গুণ, তিন সঙ্গী-তে তাই যেন মনের কার্য ও নামধাম গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত। তিন সঙ্গীর বৈজ্ঞানিকতার ইহা একটা কারণ মনে হয়।" ('বাংলা সাহিত্যের নরনারী')।

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিককে গল্পের উপাদানরূপে গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ অশীতি-স্পৃষ্ট জীবনে নোতুন করে প্রমাণ দিলেন যে, তাঁর শরীর জরাগ্রস্ত হলেও মন জরার অধীন হয় নি, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তা নবীন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সখ্য, 'বনবাণী' ও 'বিশ্বপরিচয়'-রচনার যোগফল দেখা গিয়েছে 'তিনসঙ্গী' গল্পগ্রন্থে। গল্পগুচ্ছ কবি-অভিলাষের ফল, তিনসঙ্গী বিজ্ঞান-কৌতূহলের ফল।

তাই 'তিনসঙ্গী' সবচেয়ে আধুনিক—সে কারণে নির্মোহ সত্যোপাষক, অকুণ্ঠ যৌবনানুরাগী, অলজ্জ রিয়ালিজমের পূজারী।

এই রিয়ালিজম রবীন্দ্র-সাহিত্যে আশ্চর্য ঘটনা। 'এখানকার যুগের সাদায়-কালোয় মেশানো খাঁটি রিয়ালিজম সোহিনী-চরিত্রে বর্তমান', এ'কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবুল করেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল কথা শান্তি ও সৌষম্য, ভারসাম্য ও সংযম, শালীনতা ও আস্তিকতা। শেষ জীবনে ছবিতে, গদ্যকবিতায় ও 'তিনসঙ্গী' গল্পগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই দীর্ঘকালের সযত্ন-পোষিত শান্তি ও সংযমের দুর্গ ভেঙে বেরিয়েছেন। চেতন মনের সুনির্বাচিত সুন্দর উপাদান নয়, অবচেতন মনের বিশৃঙ্খল ভয়ঙ্কর উপাদান প্রাধান্য লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে। এই মুক্তির পরিচয় গদ্যকবিতায় ভাঙাচোরা জগতে ও 'তিন সঙ্গী'-র সোহিনী চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ যে স্বভাবতই আলোকের উপাসক, তাঁর চেতনায় জগৎ যে স্বভাবতঃই আলোকময়। তা এইসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয়েছে। 'প্রান্তিক' ও 'রোগশয্যায়' কাব্যে অবচেতন অর্ধ-জাগর দুঃস্বপ্নের যে জগৎ ধরা পড়েছে, তা রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনপেক্ষিত, অপ্রত্যাশিত। অবচেতন লোকের অন্ধকার, ছায়াময় জগতের ভয়াবহতা খুব স্পষ্ট করে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের ছবিতে। এই অবচেতন ছায়াময় জগতকে সচেতনভাবে গল্পে-উপন্যাসে কবিতায় রবীন্দ্রনাথ আনেন নি। আর আনেন নি বলেই তিনি টলষ্টয়, ডস্টয়েভস্কী, টমাস মানের সমকক্ষ ঔপন্যাসিক হতে পারেন নি। কিন্তু ছবিতে তা তিনি পেরেছেন। শেষ জীবনের কিছু কিছু কবিতায় তা তিনি প্রকাশ করেছেন, যেমন,—

> দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়
> দেহ মোর ভেসে যায়
> কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
> নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ।
>
> (প্রান্তিক)

কিন্তু এই দেখা স্বল্পকালস্থায়ী, কবি চেতনার সুষম শান্তি ও আলোকের জগতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। বোদলেঅরের কবিতায় এই ছায়াময় অবচেতনের পরিচয় পাই। তাই মানুষের অবর অর্ধের চেতনা রবীন্দ্রনাথে ক্বচিৎ দেখা যায় বলেই আমাদের স্বীকার করতে হয়। 'তিন সঙ্গী'র নায়িকাচিত্রণে, বিশেষ করে

মোহিনীতেই তা খানিকটা লক্ষ্য করা যায়। অবচেতন লোকের পরিচয়লাভের ফল মোহিনী-চরিত্র। মোহিনীর সতীত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তাঁর সমগ্র জীবনের নারীতত্ত্বের মূর্তিমান প্রতিবাদ।

'তিনসঙ্গী'র গল্প উপস্থাপনের ভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'শেষকথা' গল্পের গোড়াতেই জিওলজিষ্ট নায়ক নবীনমাধব সেনগুপ্তের মুখে লেখক সে-কথা বলেছেন: "জীবনের প্রবহমান ঘোলা রঙের হ-য-ব-র-ল'র মধ্যে হঠাৎ যেখানে গল্পটা আপন রূপ ধরে সদ্য দেখা দেয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই নায়ক-নায়িকারা আপন পরিচয়ের সূত্র গেঁথে আসে। পিছন থেকে সেই প্রাক্‌গাল্পিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতেই হয়।......কী নাম নেব তাই ভাবছি, রোমান্টিক নামকরণের দ্বারা গোড়া থেকেই গল্পটাকে বসন্তরাগে পঞ্চমসুরে বাঁধতে চাই নে।"

নবীনমাধব আরো বলেছেন, "এই জাগ্রত-বুদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিখেছি।" এ তো গল্পকারের নিজের কথাই; তিনি এখন বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই বুদ্ধি-ভিত্তিক রিয়ালিষ্টিক গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

'ল্যাবরেটরি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ গল্পের গঠন সম্পর্কে একটি সুপ্রযুক্ত মন্তব্য ব্যবহার করেছেন: "জীবনের কাহিনী সুখে দুঃখে বিলম্বিত হয়ে চলে। শেষ অধ্যায়ে কোলিশন লাগে অকস্মাৎ ভেঙেচুরে স্তব্ধ হয়ে যায়। বিধাতা তাঁর গল্প গড়েন ধীরে ধীরে, গল্প ভাঙেন এক ঘায়ে।"

'তিন সঙ্গী'র তিনটি গল্পেই এই কৌশল অনুসৃত হয়েছে। গল্পের আরম্ভ মন্থর, বাঁধুনি নিপুণ; কিন্তু যখন একটি নিশ্চিত পরিণতি প্রত্যাশিত, তখন লেখক এক ঘায়েই নিশ্চিত পরিণতিকে ভেঙে দিয়েছেন। বিভার প্রতি অভীককুমারের আকর্ষণের পরিণতি ঘটেছে অভীককুমারের অন্তর্ধানে ('রবিবার')। অচিরার নবীনমাধবের আকর্ষণের পরিণতি ঘটেছে অচিরার আকস্মিক বিদায়-গ্রহণে ('শেষ কথা')। আর রেবতী-নীলার বিবাহ যখন নিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে, তখন উপসংহারে লেখক-বিধাতার অট্টহাস্যে পাঠকের সকল প্রত্যাশা ভেঙে পড়েছে।

॥ ৩ ॥

'শেষ কথা' গল্পের পরিবেশ ছোটনাগপুরের অরণ্য। ফোর্ডের কারখানায় যন্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত ও ইওরোপের নানা কেন্দ্রে খনিজবিদ্যায় অভিজ্ঞ হয়ে ভূতপূর্ব বিপ্লবী বর্তমানের কঠোর বিজ্ঞানী নবীনমাধব সেনগুপ্ত যেদিন আরণ্য পরিবেশে উপস্থিত হল, সেদিন সে ভাবতেও পারে নি তার জন্য কি আশ্চর্য রহস্য এই অরণ্যে রয়েছে। রোদে-পোড়া তার রঙ। প্রাণসার লম্বা দেহ, শক্ত বাহু, দ্রুতগতি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, স্পষ্ট নাক চিবুক কপাল নিয়ে নবীনমাধবের জোরালো চেহারা।

'শেষ কথা' নিঃসন্দেহে প্রেমের গল্প। নবীনমাধব বাংলাদেশের কন্যা-দায়িকদের ও ইওরোপ-আমেরিকার মোহিনী নারীকুলের আশাভঙ্গ করেছে। সে নিজেই বলেছে এ ব্যাপারে তার 'স্বভাবটা কড়া'। 'মেয়েদের ভালবাসা নিয়ে যারা অহংকারের বিষয় করে', সে তাদের ঘৃণা করে। আবার 'মেয়েদের নিয়ে রসের পালা শুরু করে তারপরে সময় বুঝে খেলা ভঙ্গ করা'ও তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তার ব্রত জিওলজি-চর্চা, পৃথিবীর ছেঁড়া স্তর থেকে তার বিপ্লবের ইতিহাস বের করা তার কাজ।

ছোটনাগপুরের অরণ্য ধীরে ধীরে নবীনমাধবের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। সে কবুল করেছে যে তার নিজের মধ্যে যে আরণ্যক লুকিয়ে ছিল, সে আজ বেরিয়ে এসেছে, সে যুক্তি মানে না, মোহ মানে। আরণ্য-প্রভাব সে কবুল করেছে এই সংহত মন্তব্যে—'বনের একটা মায়া আছে, গাছপালার নিঃশব্দ চক্রান্ত, আদিম প্রাণের মন্ত্রধ্বনি। দিনে দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে তার উদাত্ত সুর। রাতে দুপুরে মন্দ্রগম্ভীর ধ্বনি, গুঞ্জন করতে থাকে জীবচেতনায়, আদিম প্রাণের গূঢ় প্রেরণায় বুদ্ধিকে দেয় আবিষ্ট করে।' যে এই ভাবে তার জীবনে আরণ্য-প্রভাবকে গ্রহণ করেছে, তাকে নির্মোহ কঠোর বিজ্ঞানী বলে সম্পূর্ণ মেনে নিতে মন সায় দেয় না, সোনারতরী-বনবাণীর কবির অনুভূতি এখানে প্রকাশিত হয়েছে। কৃপণ পাথরের মুঠির মধ্য থেকে ননীমাধব যখন রেডিয়ম-কণা সন্ধান করে চলেছে, তখন সে দেখা পেল অচিরার। তার 'শ্যামল দেহের কোমলতায় বনের লতাপাতা আপন ভাষা যোগ করেছে' বলে নবীনমাধবের মনে হল।

নবীন সাধকের গবেষণাক্ষেত্র হিসাবে এই অরণ্যভূমির আবশ্যকতা আছে; কিন্তু তার জীবনে আরণ্য-প্রভাবের প্রতিক্রিয়ার আবশ্যকতাও কম নয়। আর অচিরা? তার আত্মানুসন্ধানে ক্ষেত্ররূপেও অরণ্যের প্রয়োজন রয়েছে।

অচিরার সাধনা আদর্শের সাধনা। ভালবাসার, সতীত্বের সাধনা। অচিরা তার একদা-প্রত্যাখ্যাত প্রেমকে মনে মনে পূজা করেছে, প্রেমিকের ব্রত-চ্যুতিতে তার সংকল্পচ্যুতি ঘটে নি। অচিরা বলেছেঃ—'ভালবাসার আদর্শ আমাদের পূজার জিনিস। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিসটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর। ...এখন আমার কাছে ভালোবাসা ইম্পার্সোনাল। কোনো আধারের দরকার নেই। ...আপনাদের (পুরুষদের) সম্পদ জ্ঞানের—উচ্চতম শিখরে সে জ্ঞান ইম্পার্সোনাল। মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ের, যদি তার সব হারায়—যা কিছু বাহ্যিক, যা দেখা যায়, ছোঁওয়া যায়, ভোগ করা যায়, তবু...বাকি থাকে তার সেই ভালোবাসার আদর্শ যা অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ—অর্থাৎ ইম্পার্সোনাল।"

কিন্তু অরণ্যের প্রভাবে, সেইসঙ্গে নবীনমাধবের আকর্ষণে অচিরা এই তপস্যা থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছে বলে আক্ষেপ করেছে, বলেছে—"দেখলুম ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছি—যে চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসেছিল, তার প্রেরণা এই ছায়াচ্ছন্ন বনের নিশ্বাসের ভিতর থেকে, সে আদিম প্রাণের শক্তির। মাঝে মাঝে এখানকার রাক্ষসী রাত্রির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে মনে হয়েছে, একদিন আমার দাদুর কাছে থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে বুঝি এমন প্রবৃত্তিরাক্ষস আছে। তার বিশ হাত দিনে দিনে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।"

অরণ্যের অন্ধশক্তি নবীনমাধবকে আদিম প্রাণের মন্ত্রধ্বনি শুনিয়ে যাদু করেছে, আর অচিরা তাকে প্রবৃত্তিরাক্ষস বলে মনে করেছে ও তার হাত এড়াবার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করছে। নবীনমাধব ও অচিরা—উভয়েরই চরিত্র প্রকাশের যোগ্য পটভূমি এই আরণ্য পরিবেশ। এই সুপ্রাচীন অরণ্যের মধ্যে একটা অন্ধ প্রাণের শক্তি আছে। তাই অচিরাকে নবীনমাধবের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়েছে। 'দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শ গড়ে তোলে, প্রাণশক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে। এরই প্রভাবে অচিরা পালাতে চেয়েছে এবং আকস্মিকভাবে পরিচয়কে খণ্ডিত করেছে। এই পলায়নের মধ্য দিয়েই অচিরা প্রাণশক্তিকে স্বীকার করে গেছে। সতীত্বের আদর্শ আদিম

প্রাণের শক্তির কাছে অসহায়ভাবে পরাজিত হতে বাধ্য, নবীনমাধবকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে অচিরা স্বীকার করেছে।

'শেষ কথা' গল্পের অরণ্যপটভূমি গল্পের প্রয়োজনেই এসেছে। তবু তার স্বতন্ত্র মহিমা আছে। তার উদাত্ত সুর, তার মন্ত্রগম্ভীর ধ্বনি, তার রহস্যময় গুঞ্জন প্রাণে যে সাড়া জাগায়, এই গল্পে তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি।

॥ ৪ ॥

"রবিবার গল্পটি ও ল্যাবরেটরি গল্পের পারিপার্শ্বিক একজাতীয় এবং দুটিই শেষের কবিতার ইঙ্গ-বঙ্গী সমাজ, না এদেশী না ওদেশী, শিক্ষা-দীক্ষায়, আচার আচরণে কলিকাতার বিত্তশালী কুশিক্ষিত এক সম্প্রদায়ের চিত্র। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কবি কাছে হইতে এই সম্প্রদায়টিকে কটাক্ষে দেখিয়াছেন। এবং সময়মতো ব্যবহারের জন্য তাহাদিগকে স্মৃতিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। কবি যে ইচ্ছা করিলে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বাস্তবপন্থী হইতে পারেন এই সব চিত্র তাহার প্রমাণ।" (প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প')

'রবিবার' গল্পের অন্যান্য পাত্রপাত্রী থেকে নায়িকা বিভা স্বতন্ত্র। সে আস্তিক। তার চারদিকে শুচিতা ও সম্ভ্রম বিরাজমান, তার চেহারায় রূপের চেয়ে লাবণ্য বড়ো। প্রগতি-সমাজের প্রধান পুরুষ দুর্দান্ত নাস্তিক অভীককুমার তাকেই ভালোবাসে। "বী, আমার মধুকরী, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে আবিষ্কার করবে বলো"—এই বলে' অভীক আত্মসমর্পণে উন্মুখ। কিন্তু বিভার মৃত পিতার নির্দেশানুযায়ী অভীক পাত্র হিসাবে অনুপযুক্ত।

আর বিভার কথায় অভীক 'অদ্ভুত, সৃষ্টিকর্তার অট্টহাসি।' "অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁদের। আঁট লম্বা দেহ গৌরবর্ণ, চোখ কটা, নাক তীক্ষ্ণ, চিবুকটা ঝুলছে যেন কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে।" অভীক ঘোরতর নাস্তিক, আচারনিষ্ঠ বৈদিক ব্রাহ্মণ পিতার ত্যাজ্য-পুত্র। অভীক চিত্রকর, আবার মেকানিক। সে মোহমুক্ত আর্টিস্ট, ভক্তের দল জয়ধ্বনি দিয়ে বলে, অভীক বাঙাল টিশিয়ান। অভীককুমার আসলে অমিত রায়ের (শেষের কবিতা) চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছে। যে সমাজের বিরুদ্ধে অমিত রায়ের প্রতিবাদ তাকেই সে স্বীকার করে বিবাহ করেছে। অভীকও অদূর ভবিষ্যতে হয় তো তাই করবে অথবা না-ও করতে পারে. আপাততঃ অভীকের আর্টিস্ট-খ্যাতির আশায় সমুদ্রযাত্রায় কাহিনীর আকস্মিক সমাপ্তি ঘটেছে।

এই গল্পরচনার আগেই ইওরোপ-আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনী হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অস্বীকৃত ছায়ালোক, অন্ধকার জগৎ, স্থূল আদিম পরুষ রুক্ষ অবচেতন লোকের প্রতিভাস ধরা দিয়েছে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের ছবিতে। চিত্রী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ দুর্ধর্ষ, নিয়মের বাইরে তাঁর দুঃসাহসী পদক্ষেপ। অভীককুমারও শিল্পজগতের কালাপাহাড়। চিত্রীর মর্যাদা দ্বারা সে বিভাকে অভিভূত করতে চেয়েছে। তার জীবনে সবই অস্থায়ী, কেবল 'বী মধুকরী', বিভা তার কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণ-শক্তি। সেকারণে বিদেশযাত্রার পূর্বে লিখিত পত্রে বিভার কাছে অভীককুমারের স্বীকৃতি: 'তুমি স্পষ্ট করে আমাকে তোমার ভালোবাসা জানাওনি, কিন্তু তোমার স্তব্ধতার গভীর থেকে প্রতিক্ষণে যা তুমি দান করেছ, এই নাস্তিক তাকে কোনো সংজ্ঞা দিতে পারেনি—বলেছে, অলৌকিক। এরই আকর্ষণে কোনো একভাবে হয়তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভগবানেরই কাছাকাছি ফিরেছি।—তোমার কাছ থেকে আজ দূরে এসে ভালবাসার অভাবনীয়তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার মনের মধ্যে। যুক্তি-তর্কের কাঁটার বেড়া পার করিয়ে দিয়েছ আমাকে—আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে লোকাতীত মহিমায়। এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে।' এখানেই বিভার জয়।

অশীতিস্পৃষ্ট রবীন্দ্রনাথের চরম কীর্তি সোহিনী-চরিত্র। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য আমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন পাঠকমনকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলে। এই গল্পের নায়ক-নায়িকা অ-সাধারণ, ততোধিক অসাধারণ তাদের ভালোবাসা। এঞ্জিনিয়র নন্দকিশোর আর পাঞ্জাবী মেয়ে সোহিনীর মধ্যে যে প্রেমের বন্ধন, তা শাস্ত্রনিয়মাধীন নয়। সোহিনী তার বিয়ে করা স্ত্রী নয়, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু। নন্দকিশোর অসবর্ণ-বিবাহ পছন্দ করতেন না, তিনি বলতেন, 'স্বামী হবে এঞ্জিনিয়র আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনী, এটা মানবধর্ম-শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।' সোহিনী নন্দকিশোরের যোগ্যা সহধর্মিণী, নন্দকিশোরের বিজ্ঞানসাধনাকে সোহিনী প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছিল, ল্যাবরেটরিতে সোহিনী ছিল নন্দকিশোরের যোগ্যা সহকর্মিণী। তথাকথিত সতীত্ব রক্ষায় সোহিনীর কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না, নীলা তার মেয়ে বটে, কিন্তু সে নন্দকিশোরের ঔরসজাত কন্যা নয়, কার তা বলা কঠিন। সোহিনী নিজেই বলেছে যে তার জন্মস্থানে শয়তানের দৃষ্টি আছে আর নন্দকিশোরের মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে। সোহিনী আরও বলেছে: 'অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি। কিন্তু আমার

উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। এইভাবে উভয়ের মিলন হল। এই মিলনের মর্যাদা নন্দকিশোরের মৃত্যুর পর সোহিনী প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেছে। স্বামীর প্রতি আনুগত্য তার কাছে সতীত্বরক্ষা নয়, সায়ান্সে উৎসাহ, ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজকে ঠিকমতো চালানোই সতীত্ব। সোহিনী বলেছে, 'আমার শুকনো পাঞ্জাবি মন। আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে পড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না।'

এই অকুণ্ঠ অলজ্জ আত্মস্বীকৃতি রবীন্দ্র-গল্পে তথা বাংলা গল্পে দ্বিতীয়-রহিত।

নন্দকিশোর দুর্ধর্ষ পুরুষ। কর্মীরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা স্বোপার্জিত। মেধাবী ছাত্র, পরিশ্রমী এঞ্জিনিয়র সংসার থেকে নিজের মূল্য ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এবিষয়ে তাঁর কোনো খুঁতখুঁতানি ছিল না। অর্থ করেছিলেন প্রচুর। বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ে ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নন্দকিশোর অর্থলোভী ছিলেন না, বিদ্যালোভী ছিলেন। এই পোড়া দেশে জ্ঞানের উদার ক্ষেত্র—গবেষণার প্রশস্ত অবসর সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এই কাজে তিনি যোগ্যা সঙ্গিনী পেলেন সোহিনীকে। সোহিনীর পূর্ববর্তী জীবন নির্মল নয়, নিভৃত নয়। তার সঙ্গে নন্দকিশোরের মিল ব্রতের মিল। সুকঠোর সুন্দর তার চেহারা। নন্দকিশোর 'দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্ ঝক্ করছে ক্যারেকটরের তেজ—বোঝা গেল ও নিজের দাম নিজে জানে, তাতে একটুমাত্র সংশয় নেই।' নন্দকিশোরের মনের কষ্টিপাথরে দাগ পড়ল সোহিনী নামক দামী ধাতুর।

এহেন সোহিনীর মেয়ে নীলিমা ওরফে নীলা। মায়ের সঙ্গে তার মিল এইখানে যে পুরুষসঙ্গলাভের তার কোনরকম বাছবিচার নেই, অমিল এইখানে যে সোহিনীর দুর্লভ ক্যারেকটরের তেজ নেই। তাই সে নিজে ডুবেছে, তরুণ বিজ্ঞানী ডক্টর রেবতী ভট্টাচার্যকে ডুবিয়েছে এবং জাগানী ক্লাবের দলবল নিয়ে সোহিনীর সাময়িক অনুপস্থিতিতে নন্দকিশোরের সাধনক্ষেত্র ল্যাবরেটরি ডোবাতে চেয়েছে।

নীলা সোহিনী অপেক্ষা নিকৃষ্ট চরিত্র, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। 'পাণ্ডিত্যের চাপে রেবতীর পৌরুষের স্বাদ ফিকে হয়ে গেছে—তাকে নীলার যথেষ্ট পছন্দ নয়। কিন্তু ওকে বিবাহ করা নিরাপদ, বিবাহোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দেবার জোর তার নেই। শুধু তাই নয়। ল্যাবরেটরির সঙ্গে সে লোভের বিষ জড়ানো

আছে তার পরিমাণ প্রভূত।' এই মতলবে নীলা পিসিমার অঞ্চলাশ্রয়ী কাপুরুষ রেবতীকে লোভ দেখিয়ে মায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে।

আর সোহিনী? সে বলেছে: 'তাঁর (নন্দকিশোরের) ল্যাবরেটরি আমার পূজোর দেবতা হয়েছে। ইচ্ছে করে এখানে মাঝে মাঝে ধূপধূনা জ্বালিয়ে শাঁখ-ঘণ্টা বাজাই। —আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি, সত্যি কথা বলতে আমার বাধে না। —মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে—পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগে নি। কিছু আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারে নি। যাই হোক, তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জ্বলছে সেই হোমের আগুন।'

সোহিনীর কনফেশুন এত মৌলিক যে আমরা বিস্মিত হবার অবকাশ পাই না। তার ক্যারেকটরের তেজ ঝক্‌ঝক্ করছে, 'ল্যাবরেটরি' গল্পটি তার আভায় উজ্জ্বল। নীলার মতো আত্মতৃপ্তা ভোগবিলাসিনী ও রেবতীর মতো কাপুরুষের পক্ষে সোহিনীকে বুঝা কঠিন। একমাত্র নন্দকিশোর মল্লিক বুঝে সোহিনীর প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। আর বুঝেছেন অধ্যাপক চৌধুরী।

'ল্যাবরেটরি' গল্পের উপসংহারে নীলা-রেবতী মিলন-পরিণতি আকস্মিকভাবে খণ্ডিত, রেবতীর অধঃপতনে লেখক-বিধাতার অট্টহাস্য শুনতে পাই। আর বিজ্ঞানী রেবতীর এই শোচনীয় অধঃপতনের পটভূমিতে নন্দকিশোরের যোগ্যা উত্তরসাধিকা সোহিনীর চরিত্র আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সোহিনী-চরিত্রচিত্রণে অশীতিপর কবি যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তা সর্বথা অভিনন্দনযোগ্য। আজ পর্যন্ত বাংলা গল্পে কারেকটরের এই তেজ আর কোনো মেয়ে দেখাতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আজন্মকালের সংস্কারের বন্ধনকে অস্বীকার করে তাঁর মনের সজীবতা ও তারুণ্যের আশ্চর্য পরিচয় এখানে উপস্থিত করেছেন।

নন্দকিশোরের মতো বাঙালি পাঠক কি সোহিনীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেবে?

'ল্যাবরেটরি' গল্প প্রকাশিত হবার পর শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে রবীন্দ্র-নাথ যে-কথা বলেছিলেন, তা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য: 'আর সকলে কী বলছে? একেবারে ছি ছি করছে তো? নিন্দায় আর মুখ দেখানো যাবে না। আশি বছর বয়সে রবি ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়েছে—সোহিনীর মতো এমন একটা মেয়ের সম্বন্ধে এমন করে লিখেছে। সবাই তো এই বলবে যে,

এটা লেখা ওঁর উচিত হয় নি ?—আমি ইচ্ছা করেই তো করেছি। সোহিনী মানুষটী কি রকম,—তার মনের জোর, তার লয়াল্‌টি, এই হল আসলে বড় কথা—তার দেহের কাহিনী তার কাছে তুচ্ছ। নীলা সহজেই সমাজে চলে যাবে। কিন্তু সোহিনীকে বাধবে। অথচ মা আর মেয়ের মধ্যে কত তফাত সেইটেই তো বেশী করে দেখিয়েছি।' (শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ঃ 'কবি-কথা' প্রবন্ধ ঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা' কার্তিক-পৌষ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ)।

গল্পকার রবীন্দ্রনাথের শক্তির শেষতম ও নবতম পরিচয় সোহিনী-চরিত্র।

॥ ৬ ॥

'তিন সঙ্গী'র স্বাতন্ত্র্য কেবল গল্প-উপস্থাপনে ও চরিত্রচিত্রণে নয়, ভাষাতেও পরিস্ফুট। জরাবিজয়ী দুঃসাহসী তারুণ্যশক্তিসম্পন্ন শিল্পীর যোগ্য বাহন এই সাবলীল নমনীয় অলংকৃত ভাষা। এই গল্পগ্রন্থের বর্ণনায় যে অনায়াসনৈপুণ্য, ভাষাচালনায় যে ক্ষিপ্রতা, শব্দপ্রয়োগে যে মৌলিকতা পরিলক্ষিত হয়, তা গদ্য-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের কীর্তিবাহক। 'তিন সঙ্গী'র ভাষায় যে নাটকীয় উপাদান ও সর্বগামিতার লক্ষণ বর্তমান, তা এককথায়, চলতি বাংলা গদ্যের চরম ঐশ্বর্যরূপ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এখানে অলংকার দৃশ্যমান নয়, কলাকৌশল স্পষ্ট নয়। নমনীয়তা ও কাঠিণ্যের রমণীয় পরিণয় এই ভাষায় সাধিত হয়েছে।

'শেষকথা' গল্পের নায়ক যখন অরণ্যে 'পাথরকে প্রশ্ন করে মাটির সন্ধানে' বেড়াচ্ছিল, সে সময়ের বর্ণনা এইরূপ।—

'পলাশফুলের রাঙা রঙের মাৎলামিতে যখন বিভোর আকাশ। শালগাছে ধরেছে মঞ্জরী, মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ব্যবসাদাররা মৌ সংগ্রহে লেগে গিয়েছে। কুলের পাতা থেকে জমা করছে তসরের রেশমের গুটি। সাঁওতালরা কুড়োচ্ছে পাকা মহুয়া-ফল। ঝিরঝির শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপছিপে নদী, আমি তার নাম দিয়েছিলুম—তনিকা।'

'তিন সঙ্গী'র ভাষা এই ছিপছিপে নদীর মতো। যৌবনের উচ্ছলতা ও বসন্তের সরসতা, রঙের মত্ততা ও প্রাণের চাঞ্চল্য এই ভাষায় বর্তমান। চলতি বাংলা গদ্যের উচ্ছ্বিত রূপ 'তিন সঙ্গী'র ভাষা। পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর রইল এই ভাষায়।

গাজিপুর ঃ পদ্মাতীর ঃ রবীন্দ্রনাথ

“আমার কল্পনার উপর নূতন পরিবেষ্টনের প্রভাব বার বার দেখেছি।”
'মানসী' কাব্যের রচনাবলী-সংস্করণের 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেছেন।
নোতুন পরিবেশে রবীন্দ্র-কাব্য বারবার নোতুন পথে যাত্রা করেছে, এই সূত্রের
অনুসরণে রবীন্দ্র-সাহিত্যের গোড়ার দিকের আলোচনা করা যেতে পারে।
প্রাকৃতিক ও রোমান্টিক, দূর ঐতিহাসিক ও নিকট বর্তমান পরিবেশের
প্রভাব কত গভীরভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যে মুদ্রিত হয়েছে, তা নোতুন করে
ভেবে দেখা দরকার। আর কিছু না হোক, রবি-প্রতিভাকে নবরূপে আবি-
ষ্কার করা যাবে। 'তোমায় নতুন করে পাব বলে' পরিবেশ-প্রভাব-পটভূমিতে
আমরা রবি-প্রতিভা-সন্ধানে নিযুক্ত হতে পারি।

১৮৯০ থেকে ১৯১০ ঃ এই বিশ বৎসরের পর্বে রবীন্দ্র-সাহিত্য আপন
ক্ষমতার জোরে নিঃসংশয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পর্বে রচিত ও
প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে—মানসী, চিত্রাঙ্গদা, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি,
কল্পনা, কণিকা, কথা ও কাহিনী, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, উৎসর্গ, স্মরণ, শিশু,
খেয়া ; গদ্যগ্রন্থ—য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি, গল্পগুচ্ছ, ছিন্নপত্র, পঞ্চভূত, শান্তি-
নিকেতন ; নাটক ও প্রহসন—মায়ার খেলা, রাজা ও রাণী, বিসর্জন, মন্ত্রী-
অভিষেক, মালিনী, বৈকুণ্ঠের খাতা, গোড়ায় গলদ, শারদোৎসব। এই পর্বে
তিনি চারটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন—হিতবাদী (সাহিত্য-বিভাগ), সাধনা,
নব পর্যায় বঙ্গদর্শন, ভাণ্ডার। এই সময়ে তিনি উত্তরবঙ্গে ও উড়িষ্যায়
ঠাকুর পরিবারের জমিদারী দেখাশোনা করেন, স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন,
শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক-রূপে
কাজ করেন। এই পর্বেই তিনি সাহিত্য-নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

এই পর্বে তিনি অতিশয় কর্মব্যস্ত ছিলেন এবং উড়িষ্যা, বিহার, বাংলা,
বোম্বাই ও উত্তরপ্রদেশে নিরন্তর ছোটাছুটি করেন। নিভৃতে নির্জনে ধ্যানের
প্রশান্তি ও অবসরলাভের সৌভাগ্য এই পর্বে খুব কমই এসেছে। মৃত্যুর
নিষ্ঠুর আঘাত তাঁকে এ-সময়েই পেতে হয়েছে। পিতারূপে, স্বামীরূপে
সংসারের কঠিন কর্তব্যভার বহন করতে হয়েছে। পিতা, ভ্রাতৃজায়া ও

সহধর্মিণীর মৃত্যুশোক, মাতৃহারা সন্তানদের প্রতি বাৎসল্য এবং দেশমাতৃকার আহ্বান তাঁকে এই পর্বে তিনদিক থেকে আকর্ষণ করেছে। অথচ এ-সময়েই তাঁর কবিতা ও গান, নাটক ও প্রহসন, গল্প ও প্রবন্ধের ডালা ভরে উঠেছে ; মহাকালের তরণীতে সাহিত্যের পাকা ফসল তিনি এ-সময়েই তুলে দিতে পেরেছেন।

কর্মক্লান্ত নগরজীবনের শ্রান্তিপিষ্ট কবি বার বার এ-সময় প্রকৃতির কাছে ছুটে যেতে চেয়েছেন এবং প্রকৃতিকে অসংস্কৃত রূপেই গ্রহণ করার জন্য তার দিকে আলিঙ্গনের ব্যগ্র বাহু বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই প্রকৃতিপ্রেমের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বিধৃত হয়েছে উপরিলিখিত কাব্যনিচয়ে ও গল্পগুচ্ছে। সংসারের সহস্র দাবি মিটিয়েই তিনি কিভাবে প্রকৃতিকে অন্তরের মধ্যে সত্যরূপে গ্রহণ করেছেন, তার পরিচয় এখানেই পাই। পদ্মার বুকে বজরায় তিনি অকারণ পুলকে ভেসে বেড়াতে পারেন নি। জমিদারীর কাজ, কলকাতায় সংসার ও সমাজ, সাহিত্যপত্রিকা ও স্বদেশী আন্দোলন, বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিদ্যালয়ের সহস্র চিন্তা তাঁর নির্জন সাধনায় হানা দিয়েছে। নির্বিঘ্ন প্রকৃতিধ্যান ও সৌন্দর্য সম্ভোগের অবসর এ-সময় তিনি পান নি।

অথচ এই পর্বেই দেখি প্রকৃতির নব নব সৌন্দর্যধ্যানে কবিমন কী ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, কবিতায় গল্পে প্রবন্ধে ভাষণে ছায়াপাত করেছে, কাব্যপথে মোড় ফেরার ঘণ্টা বেজে উঠেছে। কবি যে কর্মের ক্রীতদাস ছিলেন না, তিনি যে ধ্যানের মুক্তপুরুষ ছিলেন, তার পরিচয় এখানে পাই। প্রতিভার আগ্নেয় কিরীট রবীন্দ্রনাথ মাথায় পরেছিলেন, বেদনার মূল্যে তা ক্রীত, শোকের অনলে তা পরিশুদ্ধ। সেই মুক্ত শুদ্ধ বাণীসাধক কিভাবে সংসারের সহস্র বন্ধন ও পিছুটানকে আকর্ষণ করে প্রকৃতির আনন্দ দু'হাত ভরে গ্রহণ করে জীবনে সম্ভোগ করেছিলেন, তার পরিচয় এই পর্বে আমরা পাই।

॥ ২ ॥

গাজিপুর কবিজীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 'মানসী' কাব্যের প্রধান ২৮টি কবিতা এখানে বাসকালে রচিত হয়। এই রোমান্টিক শহর কবিমনে শিশুকাল থেকেই স্বপ্নের ঘোর সৃষ্টি করেছিল। গাজিপুরে

যখন তিনি যান, তখন পিতা বর্তমান, সংসারের জোয়াল কাঁধে নিতে হয় নি, পত্নী মৃণালিনী দেবী ও শিশুকন্যা বেলাকে নিয়েই তাঁর সংসার। গাজিপুর তাঁকে টেনেছিল—দুটি কারণে—গাজিপুরের গোলাপ-খেত, এর অনুষঙ্গে মনের মধ্যে পেয়েছিলেন রোমান্স-স্বর্গ সিরাজের আকর্ষণ; এবং প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী দুর্গমালা। বলা বাহুল্য, বাস্তবের গাজিপুর রোমান্সের গাজিপুরের সমকক্ষ হতে পারল না। ১২৯৪ বঙ্গাব্দের শেষে তিনি গাজিপুর যান, ১২৯৫-এর বর্ষাশেষে কলকাতায় ফেরেন। এই ছয় মাসে গাজিপুরে রচিত কবিতাগুলি রবীন্দ্র-কাব্যের মূল্যবান ফসল। গাজিপুর সিরাজ-সমরখন্দ নয়, আগ্রা-দিল্লী নয়; তথাপি গাজিপুর কবিমানসের বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র বলে প্রমাণিত হয়েছিল। 'মানসী' কাব্যের রচনাবলী-সংস্করণের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—"আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূল হস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে।"

এই মুক্তির আনন্দ 'মানসী' কাব্যের ২৮টি কবিতায় ধরা পড়েছে। যে নোতুন পরিবেশে তিনি এগুলি রচনা করেন, তার বর্ণনাও এখানে পাই। কবি বলেছেন: "একখানা বড়ো বাংলা পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইলখানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার শর্ষের খেত; দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণটানা নৌকা চলেছে মন্থর গতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি, অনাদৃত, বাংলাদেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পূর চলছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলকচাঁপার ঘনপল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচীন একটা মহানিমগাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা। সাদা ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার চালওয়ালা পল্লী।"

এই পরিবেশে রচিত কবিতাগুলিতে 'মানসী' কাব্যের মর্মকথাটি ব্যক্ত হয়েছে। তার সুর নিস্তব্ধ অলস মধ্যাহ্নের সুর, স্বপ্নচারণায় ও রোমান্সের সৌন্দর্যলোক-পরিভ্রমণে তার জগৎ আবদ্ধ। সৌন্দর্যের স্রোতে গা ভাসাবার অনুকূল অবসরস্থল এই গাজিপুর। জোড়াসাঁকোর বৃহৎ বাড়ির নিত্য-কোলাহলের পর এই অক্ষুণ্ণ অবসর কবিকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করল।

সংসারের রহস্যকে দূর থেকে দেখার, নিভৃতে প্রেম-সম্ভোগের, পত্নীর নিরন্তর সাহচর্যের অনুকূল অবকাশ মিলল অলস প্রতপ্ত মধ্যাহ্নের কোকিল-ডাকা মুহূর্তগুলিতে। 'মানসী' কাব্যে যে বৃহতের জন্য ব্যাকুলতা, তা এখানেই দেখা গেল। ভোগের জগৎ থেকে ভোগোত্তর জীবনের কবিহৃদয়ের ব্যাকুল গভীর তীব্র ক্রন্দন এখানেই ধ্বনিত হয়ে উঠল। সংসার-প্রেমের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে কবিমানস যে তৃপ্ত নয়, জীবন-মধ্যাহ্নে, প্রতপ্ত যৌবনের মধ্য দিনেই যে ব্যাকুলতা কবিহৃদয়কে শতধা বিদীর্ণ করে দিচ্ছে, তার পরিচয় এখানে পাই। গাজিপুরের রুক্ষ উদাস প্রকৃতির প্রভাব 'মানসী' কাব্যে প্রবল। এ কাব্যের যে প্রকৃতি-দৃষ্টি, তা প্রকৃতিকে নিষ্ঠুরা রমণীরূপে দেখেছে ; প্রকৃতিকে স্নেহশালিনী জননীরূপে দেখে নি। সমাজ-সংসার-প্রকৃতিতে আপন ধ্যানের সমর্থন না পেয়ে বেদনাকাতর কবিকণ্ঠে যে আর্ত ক্রন্দনধ্বনি বেজে উঠেছে, গাজিপুর তাকেই ভাষা দিয়েছে।

কবি যখন গাজিপুরে এসেছেন, তখন সঙ্গে এনেছেন বৌ-ঠাকরুনের (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর) মৃত্যুজনিত শোক। সেই শোক তাঁর সমস্ত মনকে অধিকার করে আছে। সঙ্গিনী তাঁর পত্নী মৃণালিনী দেবী ও কন্যা বেলা। এই মৃত্যুশোক এবং পত্নীপ্রেম : এ দুয়ের টানা-পোড়েনে কবিহৃদয় ক্ষতবিক্ষত। এই পটভূমিতে গাজিপুরে রচিত কবিতাগুলি বিচার্য।

কবি বলেছেন,

> জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে
> চলেছিনু আপনার বলে,
> সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা নবীন প্রভাতে
> আরম্ভিনু খেলিবার ছলে।
>
> ['জীবন-মধ্যাহ্ন']

তারপর কুটিল হল পথ, জীবন হল জটিল, বার বার পতন ঘটল। সকল আশা ও বিশ্বাসের মৃত্যু হয়েছে, তাই কবির অশান্ত আত্মজিজ্ঞাসা— 'কোথায় এসেছি আমি, কোথায় যেতেছি, কোন্ পথে চলেছে জগৎ'। গাজিপুরের সেই 'কোমল সায়াহ্ন-লেখা বিষণ্ণ উদার প্রান্তরের প্রান্ত আম্র-বনে', 'নিদ্রাহীন পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ নিশীথে', 'দূরদূরান্তরশায়ী উদাস মধ্যাহ্নে' কবি জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান করেছেন।

নিরুদ্ধ শোক আজ বিষাদের অশ্রুতে মুক্তি পেল—

বচন-অতীত ভাবে ভরিছে হৃদয়,
নয়নে উঠিছে অশ্রুজল,
বিরহ বিষাদ মোর গলিয়া ঝরিয়া
ভিজায় বিশ্বের বক্ষঃস্থল।
প্রশান্ত গভীর এই প্রকৃতির মাঝে
আমার জীবন হয় হারা,
মিশে যায় মহাপ্রাণ সাগরের বুকে
ধূলিম্লান পাপতাপধারা। ['জীবন-মধ্যাহ্ন']

কিন্তু অত সহজেই সমস্যার সমাধান হয় না। গুরুভার শ্রান্তি কবিকে আচ্ছন্ন করে, প্রশান্ত প্রকৃতিকে নিষ্ঠুর বলে মনে হয়, কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয় আর্ত ক্রন্দন :

কত বার মনে করি পূর্ণিমা-নিশীথে
স্নিগ্ধ সমীরণ,
নিদ্রালস আঁখিসম ধীরে যদি মুদে আসে
এ শ্রান্ত জীবন। ['শ্রান্তি']

জীবন-মানসার স্মৃতি কবিকে তাড়না করে ফেরে। 'বিচ্ছেদ', 'মানসিক অভিসার', 'পত্রের প্রত্যাশা' কবিতায় কবিমনের গোপন কামনা ব্যক্ত হয়েছে। মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাতে কবি জাগ্রত হয়েছেন, আরামের শয্যাতল ছেড়ে বেদনার পথে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু কোনো সান্ত্বনাই কবিকে শান্ত করে না।

সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতাই এই কাব্যের উপজীব্য। এই তার শক্তি, এই তার দুর্বলতা। 'মানসী' কাব্যের জনপ্রিয়তার মূল এইখানে। কোনো বাস্তবাতীত প্রেরণা বা স্বর্গীয় অনুভূতি এখানে নেই। প্রকৃতি এখানে কবির কাছে 'red in tooth and claw', তা নিষ্ঠুর, অন্ধ, মানব-হৃদয়ের বেদনার প্রতি উদাসীন। কবির কাছে এখন মনে হচ্ছে,—God's in his heaven, and all's *wrong* with the world। নিষ্ঠুর উদাস প্রকৃতির পরিবেশে মানসিক অশান্তির লগ্নে এটাই সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। কবির—

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়ম-নিগড়ে
আনাগোনা মেলামেশা সবি অন্ধ দৈবের ঘটনা।

এই ভাঙে, এই গড়ে,
এই উঠে, এই পড়ে,
কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার কোথা বাজিবে বেদনা।
['নিষ্ঠুর সৃষ্টি']

'মানসী' কাব্যের প্রকৃতি-চেতনা অনেকটা বায়রনীয় চেতনার সমগোত্রীয়। মানবজীবন ও সংসার সম্পর্কে 'মানসী' কাব্যে প্রকৃতির প্রতি কোনো মায়ামমতা নাই। গাজিপুরে প্রাকৃতিক পরিবেশেও কবি সান্ত্বনা পান নি। 'প্রকৃতির প্রতি', 'মরণস্বপ্ন', 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'কুহুধ্বনি', 'জীবন-মধ্যাহ্ন' কবিতা-গুলি তার পরিচয়স্থল।

গাজিপুর সম্পর্কে কবি বলেছেন—"কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়।" এই কোকিলের ডাক 'কুহুধ্বনি' কবিতার উৎস। সংসারের সকল সংগ্রাম-কোলাহলের উপরে চিরন্তনের দাবি নিয়ে ওই কুহুধ্বনি। এ এক নোতুন Ode to the Nightingale।

'কুহুধ্বনি' কবিতার মধ্যাহ্ন-দৃশ্যটি গাজিপুরের বাংলো থেকে দেখে লেখা, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। বঙ্গেতর গ্রামের কী নিপুণ আলেখ্য!—

বসি আঙিনার কোণে গম ভাঙে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি;
বাঁধা কূপ, তরুতল, বালিকা তুলিছে জল
খরতাপে ম্লান মুখখানি।
দূর নদী, মাঝে চর, বসিয়া মাচার 'পর
শস্যখেত আগলিছে চাষি;
রাখালশিশুরা জুটে নাচে গায় খেলে ছুটে;
দূরে তরী চলিয়াছে ভাসি।

এই মধ্যাহ্ন-চিত্রের আবহ-সংগীত কোকিলের পঞ্চমে কুহুধ্বনি। তা শুনে কবির মনে হয়—

যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন সরলা সুন্দরী,
যেন সেই রূপবতী সংগীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি।

সুকুমার কর্ণে তার   ব্যথা দেয় অনিবার
গণ্ডগোল দিবসে নিশীথে ;
জটিল সে ঝঞ্চনায়   বাঁধিয়া তুলিতে চায়
সৌন্দর্যের সরল সংগীতে।
তাই ওই চিরদিন   ধ্বনিতেছে শ্রান্তিহীন
কুহুতান, করিছে কাতর ;
সংগীতের ব্যথা বাজে,   মিশিয়াছে তার মাঝে
করুণার অনুনয়-স্বর।

'মানসী' কাব্যের এই মূল সুর—বিষাদ ও শ্রান্তি—despair ও resignation।

'মানসী' কাব্যের উচ্চকোটির প্রেমকবিতাগুলি ('বধূ', 'ব্যক্ত প্রেম', 'গুপ্ত প্রেম', 'অপেক্ষা', 'সুরদাসের প্রার্থনা') গাজিপুরেই রচিত। বাস্তবজীবনে প্রেমের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিণতি ঘটে অনিবার্য ব্যর্থতায়, আমাদের সংসারের কঠোর সত্যের সঙ্গে অন্তরতম ব্যাকুলতার কোনো সঙ্গতি নেই, এই গভীর উপলব্ধি এসকল কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। জীবন-মানসী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু-আঘাতে উজ্জীবিত কবিমানসে এই সত্য গাজিপুরের অক্ষুণ্ণ অবসরের গভীর চিন্তায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

ব্যাকুল সুদূরের আহ্বান শুনি 'বধূ' কবিতায়—

"বেলা যে পড়ে এল, জল্‌কে চল্‌!"—
পুরানো সেই সুরে   কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল!
কোথা সে বাঁধাঘাট, অশথ-তল!
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে "জল্‌কে চল্‌"।

সংসারে প্রেমের অপমান ঘটে, বিকৃতি দেখা দেয়, সে-কথা কবি বলেছেন—

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত,
আঁধার হৃদয়তলে   মানিকের মতো জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো। ['ব্যক্ত প্রেম']

প্রেমের ইতিহাসে এটাই ট্র্যাজেডি।

ভবে প্রেমের আঁখি প্রেম কাড়িতে চাহে,
মোহন রূপ তাই ধরিছে।
আমি যে আপনায় ফুটাতে পারি নাই
পরান কেঁদে তাই মরিছে!

['গুপ্ত প্রেম']

এই বেদনার অপমান কবিকে সংসারের স্থূল প্রেম থেকে দূরে নিয়ে গেছে। 'মানসী' কাব্যের অন্যতম প্রধান কবিতা 'সুরদাসের প্রার্থনা' গাজিপুরে রচিত। পরবর্তী কাব্যে কবির উত্তরণের আভাস পাই এই কবিতায়। স্থূল কামনা ও ইন্দ্রিয়জ ভোগের রাজ্য ছেড়ে কবি মহত্তর প্রেমের পথে অগ্রসর হচ্ছেন, নর্মসখী মানসসুন্দরীতে রূপান্তরিত হচ্ছেন—এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত এখানে পাই। এ কবিতার দশম স্তবকে মানসসুন্দরীর প্রথম আভাস পাই :

বিশ্ব-বিলোপ বিমল আঁধার
চিরকাল রবে সে কি?
ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে
ফুটিয়া উঠিবে না কি
পবিত্র মুখ, মধুর মূর্তি,
স্নিগ্ধ আনত আঁখি?
এখন যেমন রয়েছ দাঁড়ায়ে
দেবীর প্রতিমা সম,
স্থির গম্ভীর করুণ নয়নে
চাহিছ হৃদয়ে মম,
বাতায়ন হতে সন্ধ্যা-কিরণ
পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম
নিবিড় তিমির কেশে,
শান্তিরূপিণী এ মূরতি তব
অতি অপূর্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্ত নিশি মাঝে।

মানসসুন্দরী সম্পর্কে কবি এই আশা ব্যক্ত করেছেন—

চৌদিকে তব নূতন জগৎ
আপনি সৃজিত হবে,
এ সন্ধ্যা-শোভা তোমারে ঘিরিয়া
চিরকাল জেগে রবে।
এই বাতায়ন, এই চাঁপাগাছ
দূর সরযূর রেখা
নিশিদিনহীন অন্ধ হৃদয়ে
চিরদিন যাবে দেখা।
সে নবজগতে কাল-স্রোত নাই,
পরিবর্তন নাহি,
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে
চিরদিন রবে চাহি।

দেশকালাতীত বাস্তবোত্তর এই সৌন্দর্য-প্রতিমাই মানসসুন্দরী। কবি এখন লালসা ও কামনার স্তর উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমের মহত্তর স্তরে পৌঁছেছেন, শতধাবিদীর্ণ হৃদয়ের অশান্তি ও সংশয় এখন সমাপ্ত হতে চলেছে, 'তৃপ্ত হবে এক প্রেমে সর্বপ্রেমতৃষা' তার ইঙ্গিত পেয়েছেন। 'For ever shalt thou love and she be fair' এ-কথা কবি-জীবনে সত্য হতে চলেছে। তাই গাজিপুরে রচিত এই কবিতা রবীন্দ্র-প্রেমকবিতার একটি আলোকস্তম্ভরূপে বর্তমান রইল।

'সোনার তরী' কাব্যের রচনাবলী-সংস্করণে 'মানসী' কাব্য সম্পর্কে কবি পুনর্বার বলেছেন ঃ "মানসীর অধিকাংশ কবিতা লিখেছিলুম পশ্চিমের এক শহরের বাংলাঘরে। নতুনের স্পর্শ আমার মনের মধ্যে জাগিয়েছিল নতুন নতুন স্বাদের উত্তেজনা। সেখানে অপরিচিতের নির্জন অবকাশে নতুন নতুন ছন্দের যে বুনুনির কাজ করেছিলুম, এর পূর্বে তা কখনো করিনি। নূতনত্বের মধ্যে অসীমত্ব আছে; তারই এসেছিল ডাক; মন দিয়েছিল সাড়া। যা তার মধ্যে পূর্ব হতেই কুঁড়ির মতো শাখায় শাখায় লুকিয়ে ছিল, আলোতে তাই ফুটে উঠতে লাগল।" গাজিপুরের রোমান্টিক পরিবেশ তাই মানসী-কাব্যের প্রধান প্রেরণাস্থল হয়ে রইল।

এর পর পট-পরিবর্তন ও পালা-বদল হল।

॥ ৩ ॥

'সোনার তরী' ও 'মানসী' কাব্যের রচনার মধ্যে ব্যবধান দেড় বৎসর। এই সময়ে কবি 'হিতবাদী' (সাহিত্য-বিভাগ) ও 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন ও উত্তরবঙ্গ-উড়িষ্যায় ঠাকুরবাড়ির জমিদারি-পরিদর্শনে আত্মনিয়োগ করেন। এই জমিদারি-পরিদর্শনে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অনিচ্ছা ছিল, পিতার আদেশে তিনি এই কর্মে প্রবৃত্ত হন। তার ফলে বাংলা সাহিত্যের ঘরে যে ফসল ওঠে, তা অমরতার দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। সোনার তরী-চিত্রা-গল্পগুচ্ছ-ছিন্নপত্র : এ ফসলের ক্ষেত্র পদ্মাতীরবর্তী গ্রাম ও পদ্মানদী। মধ্য-যৌবনের কবি সেদিন মধ্য ও উত্তর বঙ্গের অভ্যন্তরভাগে জলপথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। নির্বিশেষ সৌন্দর্যসন্ধান ও সবিশেষ মর্তমমতা : এ দুইই যুগপৎ রবীন্দ্র-সাহিত্যে এইকালে প্রকাশলাভ করেছে। পদ্মাতীরবর্তী গ্রাম্যজীবনের ছোট সুখ ছোট দুঃখের প্রতি কবির মমতা যেমন সত্য, তেমনি সত্য পদ্মার চরে অনির্বচনীয়ের আভাসবাহী সূর্যাস্ত-দৃশ্য। কবিহৃদয়ের প্রকৃতিপ্রেম ও সংসারাসক্তি : এ দুই-ই সত্য। এ দুয়ের টানা-পোড়েনে যে ধূপছায়া-শাড়ির বুনট—তার আঁচলে পদ্মার তরঙ্গলীলা, নিঃশব্দ সূর্যাস্ত আর উদার মধ্যাহ্ন আকাশের ছায়াপাত হয়েছে।

এই পরিবর্তিত পটভূমি সম্পর্কে কবি নিজেই মন্তব্য করেছেন : "সোনার তরী লেখা আর-এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারিনে বেগানা দেশ ; তার ভাষা চিনি সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে ; যে উদ্বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে-ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম, যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের, ক্ষেত্রে।"

[রচনাবলী-সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৪৭]

রবীন্দ্র-গল্পের শ্রেষ্ঠ ফসল যে চুয়াল্লিশটি গল্প ('গল্পগুচ্ছে'র অন্তর্ভুক্ত

সেগুলি রচিত হয়েছে পদ্মার পটভূমিতে ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের (১২৯৮-১৩০২ বঙ্গাব্দ) সময়-সীমার মধ্যে। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র কবিতাগুলিও এই সময়ে রচিত। তারপর ছোটগল্পের ধারা বন্ধ হয়েছে বাহ্যত 'সাধনা' পত্রিকার অন্তর্ধানে, সে-স্থানে পাই কাহিনী-কাব্য ও কাহিনীমূলক কবিতা (কথা, কাহিনী)। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কেবল শতাব্দীর সমাপ্তি নয়, কবিজীবনের একটি অধ্যায়েরও সমাপ্তি। কবি এলেন শান্তিনিকেতনে, ছোট-গল্পের ধারা বন্ধ, ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও স্বদেশী আন্দোলনের কর্মব্যস্ত মুহূর্তগুলিতে পদ্মার শান্তি ও আলস্য তিরোহিত, প্রবন্ধ ও উপন্যাসের দিন সমাগত। তাই পদ্মার পটভূমি ছোট-গল্পের ধাত্রী।

মানসী-তে গাজিপুরের রুক্ষ প্রকৃতি, সোনার তরী-চিত্রা-গল্পগুচ্ছে পদ্মালালিত মধ্যবঙ্গের শ্যামল প্রকৃতি, ক্ষণিকা ও চৈতালি-তে তার অনুস্মৃতি, আর খেয়া-গীতাঞ্জলি ও 'শান্তিনিকেতন'-উপদেশমালায় রাঢ়বঙ্গের কঠিন গৈরিক প্রকৃতি।

পদ্মালালিত মধ্যবঙ্গ আলোচ্য পর্বের সাহিত্যের প্রেরণাস্থল। এই পর্বে কাব্যের রসের উৎস রহস্যময়া পদ্মা আর ছোটগল্পের রসের উৎস পদ্মা ও তার শাখানদী-তীরবর্তী ছায়া-সুনিবিড় গ্রামগুলি। "হে পদ্মা, তোমায় আমায় দেখা শতবার"—রহস্যময়ী সুন্দরী পদ্মার প্রতি কবি বার বার তাঁর হৃদয়ের অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। পদ্মা রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিপুল গভীর প্রভাব মুদ্রিত করে দিয়েছে। সুদীর্ঘ জীবনের নানা পর্বে এই প্রভাবের নব নব পরিচয় বিধৃত হয়েছে। এর প্রথম সার্থক পরিচয় পেলাম উনিশ শতকের শেষ দশকে।

রবীন্দ্র-ভাষ্যকার শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এই পদ্মালালিত ভূখণ্ডের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে: "বর্ষাকালে এই অঞ্চল জলময় হইয়া গিয়া পৃথিবীর ভূগোল-পরিচয় প্রকাশ করে—তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। নদী নালা বিল ইহার জলভাগ, আর বর্ষাজলের স্ফীতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত গ্রামগুলি এবং অনন্ত শস্যক্ষেত্র ইহার স্থলভাগ। পদ্মা প্রধান নদী, অবশ্য যমুনাও (ব্রহ্মপুত্র) কম নয়; আর আছে আত্রেয়ী, নাগর, বড়ল, গোরাই (গৌরী নদী) ও ইছামতী প্রভৃতি নদনদী। আর রাজসাহী জেলা ও পাবনা জেলার একাংশ ব্যাপিয়া অনির্দিষ্ট-আকার চলন-বিল, তাহাও অগ্রাহ্য করিবার মতো নয়। রবীন্দ্রনাথের চোখে এই বিচিত্র ভূখণ্ড মানবজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিণত জীবনচিত্র যেন উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে—ইহার নিজস্ব মূল্য

যাহাই হোক, এখানেই ইহার আসমানদারির সার্থকতা। সত্য কথা বলিতে কি, ঐ সূত্রে এই ভূখণ্ড রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাদটীকায় আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে।

"এই ভূখণ্ডের কথা যখন ভাবি, বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। মনে হয়, মধ্যবঙ্গে অবস্থিত এই ভূখণ্ডে বঙ্গের মধ্যেকার কোন্ সত্য যেন প্রকাশিত হইয়াছে। মনে হয়, সিংহবাহিনী পদ্মা পরিপূর্ণ বিজয়গৌরবে আপন বামচরণ চলন-বিল-রূপী ঐ কালো অসুরটার স্কন্ধের উপর স্থাপন করিয়াছেন আর তাঁহাকে ঘিরিয়া আত্রেয়ী এবং গৌরী, বড়ল এবং নাগর নদনদীসমূহ বাঙালী-জীবনের ধ্যানের বিচিত্র পূর্ণতাকে যেন প্রকাশ করিয়াছে। এহেন ভূখণ্ড কবি-প্রতিভার যোগ্য ধাত্রী বটে! এই ভূপ্রকৃতি যেন ষড়্মাতৃকার মতো কবিকে স্তন্যদান করিয়াছে—আর তাই বুঝি কবিও প্রতিভার ষড়্মুখে জননীর ঋণ শোধ করিয়াছেন।

"এই ভুখণ্ডের প্রাকৃতিক অংশের প্রধান নায়ক পদ্মা, আর জনপদ অংশের প্রধান নায়ক অখ্যাত অজ্ঞাত মানব।"

[রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প', পৃঃ ১৬-১৭]

পদ্মা এই পর্বে কবিমানসের ধাত্রী, প্রেরণাদায়িনী, জীবনসঙ্গিনী। পদ্মাকে কবি স্বতন্ত্র মানবীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। 'ছিন্নপত্রে'র পাতায় পাতায় তার পরিচয় রয়েছে। পদ্মা কবির কাছে 'আইডিয়া' মাত্র নয়, দিব্যশরীরী সত্তা, তার উপস্থিতি ও সাহচর্য কবি অনুভব করেছেন বাস্তবসত্যরূপে। পদ্মাকে কবির মনে হয়েছে "স্নানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিঃপ্রতিমা", "ছিপছিপে মেয়ের মতো"; বলেছেন "ভাদ্র মাসের পদ্মাকে একটি প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়", "পদ্মাকে আমি বড় ভালবাসি।" এ ধরনের অজস্র অনুরাগ-মিশ্রিত মন্তব্য 'ছিন্নপত্রে' ছড়ানো রয়েছে।

পদ্মাকে রবীন্দ্রনাথ যে কত গভীরভাবে ভালবাসেন তার একটিমাত্র সাক্ষ্য 'ছিন্নপত্র' থেকে উদ্ধার করছি। ভালবাসার অনুষঙ্গ ভয়—বিচ্ছেদাশঙ্কা এখানে দেখা দিয়েছে: "হয়তো আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধ্যাবেলা আর ফিরে পাবো না। তখন কোথায় দৃশ্য পরিবর্তন হবে, আর কি রকম মন নিয়েই বা জন্মাবো! এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আমি কি

ঠিক এমনি মানুষটি তখন থাকবো! আশ্চর্য এই, আমার সবচেয়ে ভয় হয় পাছে য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি।"

[১৬ই মে, ১৮৯৬, শিলাইদা, 'ছিন্নপত্র']

এই একান্ত অনুরাগ ও প্রণয়ার্তির প্রতিধ্বনি শুনি 'পদ্মা' কবিতায় (চৈতালি):

কতদিন ভাবিয়াছি বসি তব তীরে,
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,
যদি কোনো দূরতর জন্মভূমি হতে···
পার হয়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন ?···
আর বার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে না কি দেখাশুনা তোমায় আমায় ?

এই অনুরাগের বেদনায় রবীন্দ্রনাথকে আমরা নোতুন করে পাই। ১৩০২ বঙ্গাব্দে এই বেদনা প্রকাশের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসরের ব্যবধানে রচনা-বলী-সংস্করণে দেখি তার নোতুন অভিব্যক্তি ('সোনার তরী'-র ভূমিকা, বৈশাখ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ): "আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি—বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে! পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জনসজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে।"

॥ ৪ ॥

'গল্পগুচ্ছ'য় মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব রূপলাভ করেছে, আর 'সোনার তরী'-'চিত্রা'য় বিশ্বপ্রকৃতি ও নির্বিশেষ সৌন্দর্যসাধনার কাব্যফসল সঞ্চিত হয়েছে। পদ্মার ক্ষুরধার সে প্রবাহ, অনন্ত শস্যক্ষেত্র, উন্মুক্ত গগনললাট, ব্যাকুল মধ্যাহ্ন, উদাসিনী সন্ধ্যা 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র নির্বিশেষ সৌন্দর্যলোক

গড়ে তুলেছে। প্রকৃতির ধীরস্নিগ্ধ শুশ্রূষায় কবি বার বার সঞ্জীবিত হয়েছেন। পদ্মার প্রেমে নোতুন করে বাঁধা পড়েছেন ; বলেছেন—"প্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয়, আমার পদ্মা বোধ হয় পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু, যখনই বোট ভাসিয়ে দিই, চারিদিকে জল কুল্‌কুল্‌ করে ওঠে—চারিদিকে একটা স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ মৃদু কলধ্বনি, একটা সুকোমল নীল বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামল রেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্যের একটি নিত্য-উৎসব উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, তখন আবার নোতুন করে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়।"

[৯ই ডিসেম্বর ১৮৯২, শিলাইদহ, 'ছিন্নপত্র']

সোনার তরী ও চিত্রা কাব্যের যে বিষাদ ও বৈরাগ্য, তার পটভূমি এই পদ্মালালিত ভূখণ্ড। ছিন্নপত্রের ১৪, ১৮, ২৭, ৩৫, ৬৬, ১৫২ সংখ্যক পত্রগুচ্ছ তার প্রমাণ। নিস্তব্ধতা, খোলা আকাশ ও কর্মবিরতির পটভূমিতে পৃথিবীর বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য ও বিষাদ ফুটে ওঠে, এ-সত্য কবি হৃদয়ঙ্গম করেছেন পদ্মার নির্জন চরে সান্ধ্য-ভ্রমণকালে (দ্রঃ ১৪ সংখ্যক পত্র, 'ছিন্নপত্র')। "পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম—সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মিড় টানে, আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে টান পড়ে। কাল সন্ধের সময় নির্জন মাঠের মধ্যে পূরবী বাজছিল, পাঁচ-ছ ক্রোশের মধ্যে কেবল আমি একটি প্রাণী বেড়াচ্ছিলুম।"

যৌবনমধ্যাহ্নেই সোনার তরী ও চিত্রা কাব্যের যে বিষাদের সুর, তা কেবল sad song of humanity নয়, তা প্রকৃতির অন্তর থেকে কবির অন্তরে ঠাঁই নিয়েছে। তাই পূরবীতে বা টোড়িতে বিশাল জগতের অন্তরের হা-হা ধ্বনি ব্যক্ত হয়, এ-কথাই কবির মনে হয়েছে। পদ্মার চরে যে-সন্ধ্যাকে কবি দেখেছেন, তা পূরবীর বেদনা-সুরকে বস্তুরূপ দিয়েছে। নিঃসঙ্গ পথ-যাত্রিণী সন্ধ্যা-রমণীকে দেখে কবি-হৃদয়ে যে রোমান্টিক বেদনার গীতধ্বনি উত্থিত হয়েছে, 'সোনার-তরী'-'চিত্রা'য় তো তারই ঝঙ্কার শুনি।

'বসুন্ধরা' কবিতায় যে-সন্ধ্যার চিত্রটি পাই, তা যে পদ্মাতীরের সন্ধ্যাচিত্র, এ সত্য মুহূর্তেই অনুভব করতে পারি—

দূর করো সে বিরহ
যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে

হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে
বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
দূর গোষ্ঠে মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি,
তরু-ঘেরা গ্রাম হতে উঠে ধূমলেখা
সন্ধ্যাকাশে—যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে—
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী
নির্বাসিত ; বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে—
এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী-'পরে
শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি। কিছু নাহি
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি
বিষাদব্যাকুল।

['সোনার তরী']

এই বিষাদব্যাকুলতাই 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র ধ্রুবপদ। এ বিষাদ কেবল সন্ধ্যায় নয়, মধ্যাহ্নেও। নিম্নধৃত কবিতাংশ তারই পরিচয়স্থল। হেমন্তের দ্বিপ্রহরে 'যেতে নাহি দিব'র কাতর বেদনা সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে—

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্মরে
এত ব্যাকুলতা ; অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে ; বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশ্বত্থের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী। ['সোনার তরী']

পদ্মাপ্রকৃতি একবার কবিকে বিশ্বপ্রকৃতির দিকে আকর্ষণ করে, আরেকবার গ্রামপ্রকৃতির অভিমুখে আহ্বান করে। নির্জন-সজনের সংগমে 'সোনার তরী'র কাব্যফসল দেখা দিয়েছে। নির্বিশেষ সৌন্দর্যসাধনা আর সবিশেষ মর্ত্যমমতা, এ দুই প্রধান সুরকে ব্যাপ্ত করে রয়েছে বিষাদ ও বৈরাগ্য। তা কেবল ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির নয়, কবিপ্রকৃতিরও। পদ্মাতীরবর্তী ভূখণ্ডে চরে সন্ধ্যায় মধ্যাহ্নে তারই সমর্থন। 'অক্ষমা' ও 'দারিদ্র্য' সনেটে সবিশেষ মর্ত্যমমতা, এগুলি 'গল্পগুচ্ছ'র দোসর ; আবার 'সোনার তরী', 'মানসসুন্দরী', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় নির্বিশেষ সৌন্দর্যসন্ধান, এগুলি 'চিত্রা' 'জীবনদেবতার' দোসর। 'চিত্রা'র 'সিন্ধুপারে' কবিতায় নির্বিশেষ আদর্শ-সৌন্দর্যের সন্ধানে যে কবি আত্ম নিয়োগ করেছেন, তিনিই 'স্বর্গ হতে বিদায়' কামনা করে মর্ত্যমমতার পরিচয় দিয়েছেন—"শূন্য নদীপারে অবনতমুখী সন্ধ্যা"—এ তো সেই সন্ধ্যা, যাকে 'ছিন্নপত্র'য় বার বার দেখেছি জনহীন চরের উপর দিয়ে বিষণ্ণবদনা রমণীরূপে চলে যাচ্ছেন। একবার মহিমালক্ষ্মী সৌন্দর্যপ্রতিমার পদপ্রান্তে কবির অশ্রুসিক্ত পুষ্পাঞ্জলির আত্মসমর্পণ, আরবার পদ্মাতীরবর্তী সুখদুঃখভরা মানবজীবনের জন্য ব্যাকুল বেদনাপ্রকাশ। 'সুখ' ও 'সন্ধ্যা' কবিতা দুটিতে পদ্মাতীরবর্তী গ্রাম জ বনের প্রসন্ন সরল আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে। আর এই সন্ধ্যা-বন্দনা থেকেই কবি পুনর্বার নির্বিশেষ সৌন্দর্যের পথে চলে গিয়েছেন। 'সন্ধ্যা'র শূন্যতা থেকে 'সিন্ধুপারে'র 'পউষ প্রখর শীতে জর্জর ঝিল্লিমুখর' রাতে জীবন-দেবতার প্রবল আকর্ষণে কবির নিরুদ্দেশযাত্রা। পদ্মাতীরের জনপদ কবিকে মর্ত্যমমতার পথে টানছে আর পদ্মাচরের সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত কবিকে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের অভিমুখে ঠেলে দিচ্ছে। তাই বলেছি, পদ্মালালিত মধ্যবঙ্গের এই ভূখণ্ড 'সোনার তরী'-'চিত্রা' কাব্যের, সেইসঙ্গে 'গল্পগুচ্ছ' 'ছিন্নপত্র'র প্রেরণাস্থল।

পরবর্তী কাব্য 'চৈতালি'তে মর্ত্যমমতার সুরটি প্রাধান্য লাভ করেছে। 'গল্পগুচ্ছ'র সংসারাসক্তি নতুন করে চৈতালি'র কবিতাগুচ্ছে পাই। পদ্মার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে এই পর্বে রচিত 'পদ্মা' কবিতাটিতে। 'দুর্লভ জন্ম' সনেট কবির মর্ত্যমমতার testament। আর 'মধ্যাহ্ন' কবিতা পদ্মাতীরবর্তী জনপদের একটি নিপুণ আলেখ্য। মর্ত্যমমতার সঙ্গেই রয়েছে সেই ঔদাস্য বৈরাগ্য ও বিষাদ। অলস মধ্যাহ্নের বিষাদ-সুরটি কবিমনকে আচ্ছন্ন করেছে, পরবাসী কবি শেষ পর্যন্ত নিজেকে সেই পদ্মা-তীরবর্তী জনপদবাসীদের একজন বলে মনে করেছেন। পদ্মাতীরের জনপদের

প্রতি কবির এ আন্তরিক ভালবাসা ও একাত্মতার ফলে আমরা পেয়েছি 'গল্পগুচ্ছে'র শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি। গিরিবালা, ফটিক, শুভ্রা, মৃন্ময়ী, তারাপদ, রতন, উমা প্রভৃতি বালক-বালিকাই 'গল্পগুচ্ছ'র বৃহদংশের নায়ক-নায়িকা এবং তারা পদ্মাতীরবর্তী জনপদবাসী। 'গল্পগুচ্ছ'র আলোচনায় পদ্মা ও পদ্মার স্নেহের দুলালগুলির প্রাধান্য—এই বৈশিষ্ট্য পাঠকের বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাই পদ্মাতীর ও পদ্মানদী অক্ষয় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

বোলপুর ঃ রবীন্দ্রনাথ

১৮৯৬ থেকে ১৯০৫ ঃ এই দশবৎসর রবীন্দ্রনাথের জীবনে নানা কর্মব্যস্ততা ও অশান্তির পর্ব। কখনো শিলাইদহ, কখনো কলকাতা, কখনো বা বোলপুর —কোথাও তাঁর স্থিতি নেই। ব্যক্তিগত জীবনে নানা আঘাত ও দুর্বিপাক তাঁকে এ সময় সহ্য করতে হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির জমিদারি পরিদর্শন, কুষ্টিয়ায় পাটের ব্যবসা, ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থক্ষতি ও সে ক্ষতি সামলাবার জন্য প্রচুরতর আর্থিক ঋণ, শেষপর্যন্ত বিশহাজার টাকার দেনার জালে জড়িয়ে পড়া ; স্ত্রী-পুত্রকে শিলাইদহে নিয়ে বসবাস, স্ত্রীর আপত্তি, শেষপর্যন্ত শিলাইদহে বসবাসের সংকল্প ত্যাগ ; পিতার, কন্যার, স্ত্রীর ও অন্য আত্মীয়ের মৃত্যু ; সাধনা ও বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) পত্রিকা সম্পাদনা, কলকাতায় ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্মের বাগ্‌বিতণ্ডা ; স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান, মতভেদ ও সংস্রব ত্যাগ ; বোলপুর বোর্ডিং-স্কুলকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম রূপে স্থাপনা (১৯০১), তার পরিচালন-সমস্যা—আর্থিক ও অন্যান্য সংকট ; বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকে বিলাতে প্রেরণের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্যোগ ; কন্যার বিবাহদান, পুত্র ও জামাতার শিক্ষাদান প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র কর্মের দায় ঘাড়ে নিয়ে কবি এ সময়ে চলেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, কিছুতেই কোনো বাইরের আঘাতেই তাঁর অন্তরের ধ্যানভঙ্গ হয়নি।

শতাব্দীর শেষবৎসরে—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে—চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়— 'কথা', 'কাহিনী', 'কল্পনা' ও ক্ষণিকা' ; এরপরই 'নৈবেদ্য' (১৯০১)। শিলাইদহে অশেষ কর্মব্যস্ততার মধ্যেই তিনি 'নৈবেদ্য'র গভীর ধ্যানের ও কঠিন প্রতিজ্ঞার কাব্যরূপ দান করেন। এগুলিতে প্রকৃতি-পরিবেশ বা প্রকৃতি-বর্ণনা নেই। প্রাচীন ভারতের মহান জীবনের প্রতি, তার উচ্চ সংকল্প ও কর্মসাধনার প্রতি, রোমান্সের প্রতি কবিমনের আকর্ষণ ও অনুরাগ এগুলিতে প্রকাশিত। তাই পরিবেশ-প্রভাব এখানে নেই। তারপর ১৯০৫-এ 'স্বদেশ' কাব্য—স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় লিখিত দেশপ্রেমের কবিতার সংকলন। এরপরই 'খেয়া' (১৯০৬), 'শিশু', 'স্মরণ' ও 'উৎসর্গ'। এই সময়ে 'গল্পগুচ্ছ'র আরো কিছু গল্প ও প্রচুর প্রবন্ধ—রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক,

সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; 'নৌকাডুবি' উপন্যাস ও 'হাস্যকৌতুক' 'ব্যঙ্গকৌতুক' প্রকাশিত হয়। মূলতঃ এটি গদ্যের যুগ। নানা কর্মের, সামাজিকতার, চিন্তার ও সাধনা-বঙ্গদর্শন-সম্পাদনার সমস্যা কবিকে এখানে বাহ্যত বহির্জীবনের প্রতি আকর্ষণ করেছে। এরি মাঝে 'খেয়া' কাব্য প্রকাশিত হয়েছে; তা ভগবৎচিন্তায় উদ্দীপ্ত, 'মিস্টীক'-বোধে অনুপ্রাণিত, পরিবেশ-প্রভাব-মুক্ত, বাহ্যিক কোলাহল থেকে দূরে অন্তরদেশে প্রতিষ্ঠিত। গল্পগুচ্ছর ধারা যেমন শুকিয়ে এসেছে, প্রকৃতিধ্যানের ও প্রকৃতিতে সহজ আনন্দ-লাভের পথও তেমনি সংকীর্ণ হয়েছে। 'খেয়া' কাব্যের অধ্যাত্মচিন্তাবাহী কবিতাগুলির মাঝে স্বদেশী গান ও কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, অথচ এ দুয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই; আসলে অন্তরের গভীর ধ্যান বাইরের কোলাহলে ভঙ্গ হয়নি।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাথমিক সংকটের ও স্বদেশীর উত্তেজনা থিতিয়ে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ বীরভূমেই তাঁর ধ্যানের আসন ও কর্মের পীঠ স্থাপনা করলেন। তারপর নোতুন করে প্রকৃতিকে রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাই। 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা, 'শারদোৎসব' ও 'গীতিমাল্য'-'গীতালি'-'গীতাঞ্জলি'তে রাঢ়-বঙ্গের প্রকৃতির নোতুন রূপটি দেখা গেল। এই পাঁচটি গ্রন্থের প্রকাশ কাল ১৯০৮ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ। এগুলিতে রাঢ়-বঙ্গের প্রকৃতি-বর্ণনার প্রথম ফসল সঞ্চিত হয়েছে।

'খেয়া' কাব্যের যে প্রকৃতি-বর্ণনা, তা কোনো ভৌগলিক পরিবেশে ধরা দেয় না। 'মিষ্টিক' কাব্যভাবনার যে প্রকৃতি-আলেখ্য দেখা দিয়েছে, তা দেশকালের সীমার বাইরে। 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি' কাব্যের যে শারদ-প্রকৃতি, তা খুব স্পষ্ট নয়। 'শারদোৎসব' নাটক সম্পর্কে একই মন্তব্য প্রযোজ্য। বস্তুত, এগুলির উপর নির্ভর করে রাঢ়-বঙ্গের প্রকৃতি দর্শন করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

বীরভূমের রুক্ষ বৈরাগী উদাস প্রকৃতির প্রথম নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাই 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালায় (১৯০৯-১৬)। কবির ব্যক্তিগত জীবনে এই পর্বটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০২ হইতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ: এই সাতবৎসরে মৃত্যু বার বার কবিকে আঘাত করেছে। কবিজায়া, কন্যা রেণুকা, পুত্র শমীন্দ্রনাথ, জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ, বন্ধু শ্রীশচন্দ্র এই সময়ের মধ্যে লোকান্ত-রিত হন। 'স্মরণ' কাব্য (১৯০৩) ছাড়া আর কোথাও ব্যক্তিগত শোক

প্রকাশ পায়নি। স্বদেশ-সাধনা ও অধ্যাত্ম-সাধনায় এই পর্বে কবি খুবই ব্যস্ত। শান্তিনিকেতনে এই ব্যস্ততা ও উত্তেজনা-অন্তে যখন স্থিতিলাভ করে কবি বসলেন, তখনই 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার রচনা, যদিও নিরবচ্ছিন্ন স্থিতি বা শান্তি কবির ভাগ্যে ঘটেনি। 'ধর্ম' (১৯০৯) সাত বৎসরের (১৯০০-৭) ভাষণমালার সংগ্রহ, তা কতকটা নৈর্ব্যক্তিক, ধর্মতত্ত্বের প্রকাশ্য আলোচনা-সংগ্রহ। কিন্তু 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা বীরভূমের উদাস বৈরাগী পটভূমিতে ব্যক্তিগত ধ্যানের প্রকাশস্থল। কবিজীবনের মনন ও সাধনার ফল এই উপদেশমালায় সংগৃহীত হয়েছে। জীবনশিল্পী কবির ধ্যানলব্ধ বাণীমালার উপযুক্ত পটভূমিরূপে শান্তিনিকেতনের রুক্ষ প্রান্তর, উদার গগন, শান্ত বিভাবরী, প্রসন্ন প্রভাত বর্তমান। মৃত্যুর বর্ণবিরল পটভূমিতে এগুলি গভীর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। শোকের পবিত্র অগ্নিতে দুঃখ ও মৃত্যুকে কবি নোতুন করে উপলব্ধি করেছেন, বৃহতের জন্য গভীর আন্তরিক আকুলতা প্রভাতী ও সান্ধ্য উপাসনান্তে প্রদত্ত ভাষণে প্রকাশিত হয়েছে। খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি কাব্যধারায় এবং শারদোৎসব-অচলায়তন-রাজা-ডাকঘর নাট্যধারায় যে অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতা, তারই স্পষ্ট প্রকাশ 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা।

রাঢ়-বঙ্গের উদাস বৈরাগী প্রকৃতি এই অধ্যাত্ম-সাধনার যোগ্য পটভূমি। বীরভূমের রুক্ষ উদার প্রান্তরে দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না, নিশীথের আকাশে কোথাও মলিনতা নেই, স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের সন্ন্যাসব্রত কোথাও মনকে বাঁধা পড়তে দেয় না: এ সবই কবিমনের ব্যাকুলতাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। প্রার্থনান্তিক ভাষণগুলি অধ্যাত্ম-অনুভূতির দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার পরিচয়মূলক কয়েকটি বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করছি:

[১] "কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি কেবলই আমার মনের মধ্যে ঝংকৃত হচ্ছে—'বাজে বাজে, রম্যবীণা বাজে'।...কাল রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে আমার মন সম্পূর্ণ স্বীকার করেছে 'বাজে বাজে, রম্যবীণা বাজে'। এ কবিকথা নয়, এ বাক্যালংকার নয়—আকাশ এবং কালকে পরিপূর্ণ করে অহোরাত্র সংগীত বেজে উঠেছে।...কাল কৃষ্ণ একাদশীর নিভৃত রাত্রের নিবিড় অন্ধকারকে পূর্ণ করে সেই বীণকার তাঁর রম্য বীণা বাজাচ্ছিলেন; জগতের প্রান্তে আমি একলা দাঁড়িয়ে শুনছিলুম; সেই

ঝংকারে অনন্ত আকাশের সমস্ত নক্ষত্রলোক ঝংকৃত হয়ে অপূর্ব নিঃশব্দ সংগীতে
গাঁথা পড়ছিল।" ['শোনা', শান্তিনিকেতন ১]

[২] "বিশ্বের একটা মহল তো নয়। তার নানা মহলে নানারকম
উৎসবের ব্যবস্থা হয়ে আছে। সজনে নির্জনে নানা ক্ষেত্রে উৎসবের নানা
ভিন্ন ভাব, আনন্দের নানা ভিন্ন মূর্তি। নীলাকাশতলে প্রসারিত প্রান্তরের
মাঝখানে এই ছায়াস্নিগ্ধ নিভৃত আশ্রমের যে প্রাত্যহিক উৎসব, আমরা
আশ্রমের আশ্রিতগণ কি সেই উৎসবে সূর্যতারা ও তরুশ্রেণীর সঙ্গে কোনোদিন
যোগ দিয়েছি ?" ['শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসব', তদেব]

[৩] "কালকের উৎসবমেলার দোকানি-পসারীরা এখনও চলে যায়নি।
সমস্ত রাত তারা এই মাঠের মধ্যে আগুন জেলে, গল্প করে, গান গেয়ে,
বাজনা বাজিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।

কৃষ্ণ চতুর্দশীর শীতরাত্রি। আমি যখন আমাদের নিত্য উপাসনার স্থানে
এসে বসলুম তখনও রাত্রি প্রভাত হতে বিলম্ব আছে। চারিদিকে নিবিড়
অন্ধকার, এখানকার ধূলিবাষ্পশূন্য স্বচ্ছ আকাশের তারাগুলি দেবচক্ষুর অক্লিষ্ট
জাগরণের মতো অক্লান্তভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। মাঠের মাঝে মাঝে আগুন
জ্বলছে। ভাঙা মেলার লোকেরা শুকনো পাতা জালিয়ে আগুন পোয়াচ্ছে।

অন্যদিন এই ব্রাহ্মমুহূর্তে কী শান্তি, কী স্তব্ধতা! বাগানের সমস্ত পাখি
জেগে গেয়ে উঠলেও সে স্তব্ধতা নষ্ট হয় না, শালবনের মর্মরিত পল্লবরাশির
মধ্যে পৌষের উত্তরে হাওয়া দুরন্ত হয়ে উঠলেও সেই শান্তিকে স্পর্শ করে
না।" ['মানুষ', তদেব]

[৪] "জগতে একমাত্র আনন্দই যে সৃষ্টি করে, সৃষ্টির শক্তি তো আর
কিছুরই নেই। এখানকার আকাশপ্লাবী অবারিত আলোকের মাঝখানে বসে
আনন্দের সঙ্গে তাঁর যে আনন্দ মিলেছিল সেই আনন্দ সেই আনন্দসম্মিলন
তো শূন্যতার মধ্যে বিলীন হতে পারে না। সেই আনন্দই আজও সৃষ্টি
করছে, এই আশ্রমকে সৃষ্টি করে তুলেছে, এখানকার গাছপালার শ্যামলতার
উপরে একটি প্রগাঢ় শান্তির সুস্নিগ্ধ অঞ্জন প্রতিদিন যেন নিবিড় করে মাখিয়ে
দিচ্ছে। অনেক দিনের অনেক সুগভীর আনন্দ-মুহূর্ত এখানকার সূর্যোদয়কে
সূর্যাস্তকে এবং নিশীথরাতের নীরব নক্ষত্রলোককে দেবর্ষি নারদের বীণার
তারগুলির মতো অনির্বচনীয় ভক্তির সুরে আজও কম্পিত করে তুলছে।...
এই-যে আশ্চর্য রহস্য, জীবনের নিগূঢ় ক্রিয়া আনন্দের নিত্যলীলা, সে কি

আমরা এখানকার শালবনের মর্মরে, এখানকার আম্রবনের ছায়াতলে উপলব্ধি করতে পারব না? শরতের অপরিমেয় শুভ্রতা যখন এখানে শিউলি ফুলের অজস্র বিকাশের মধ্যে আপনাকে প্রভাতের পর প্রভাতে ব্যক্ত করে করে কিছুতেই আর ক্লান্তি মানতে চায় না, তখন সেই অপর্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আরও-একটি অপরূপ শুভ্রতার অমৃতবর্ষণ কি নিঃশব্দে আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে না? এই পৌষের শীতের প্রভাতে দিক্‌প্রান্তের উপর থেকে একটি সূক্ষ্ম শুভ্র কুহেলিকার আচ্ছাদন যখন উঠে যায়, আমলকীকুঞ্জের ফলভারপূর্ণ কম্পিত শাখাগুলির মধ্যে উত্তরবায়ু সূর্যকিরণকে পাতায় পাতায় নৃত্য করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌদ্র এখানকার অবাধপ্রসারিত মাঠের উপরকার সুদূরতাকে একটি অনির্বচনীয় বাণীর দ্বারা ব্যাকুল করে তোলে, তখন এর ভিতর থেকে আর একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্মৃতি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে না? একটি পবিত্র প্রভাব, একটি অপরূপ সৌন্দর্য, একটি পরমপ্রেম কি ঋতুতে ঋতুতে ফলপুষ্পপল্লবের নব নব বিকাশে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণে তার অধিকার বিস্তার করছে না? নিশ্চয়ই করছে। কেননা, এইখানেই যে একদিন সকলের চেয়ে বড়ো রহস্যনিকেতনের একটি দ্বার খুলে গিয়েছে।" ['আশ্রম', তদেব]

[৫] "এই আশ্রমে আছে কী? মাঠ এবং আকাশ এবং ছায়া-গাছগুলি, চার দিকে একটি বিপুল অবকাশ এবং নির্মলতা। এখানকার আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চন্দ্রসূর্যগ্রহতারার আবর্তন কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে নেই। এখানে প্রান্তরের মাঝখানে ছোটো বনটিতে ঋতুগুলি নিজের মেঘ আলো বর্ণ গন্ধ ফুল ফল—নিজের সমস্ত বিচিত্র আয়োজন নিয়ে সম্পূর্ণ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। কোনো বাধার মধ্যে তাদের খর্ব হয়ে থাকতে হয় না। চার দিকে বিশ্বপ্রকৃতির এই অবাধ প্রকাশ এবং তার মাঝখানটিতে শান্তং-শিবমদ্বৈতমের দুই সন্ধ্যা নিত্য আরাধনা—আর কিছুই নয়। গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, উপনিষদের মন্ত্র পঠিত হচ্ছে, স্তবগান ধ্বনিত হচ্ছে, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর—সেই নিভৃতে, সেই নির্জনে, সেই বনের মর্মরে, সেই পাখির কূজনে, সেই উদার আলোকে, সেই নিবিড় ছায়ায়।" ['ভক্ত' শান্তিনিকেতন ২]

[৬] "দেখতে দেখতে উত্তর-পশ্চিমে ঘনঘোর মেঘ করে এসে সূর্যাস্তের রক্ত আভাকে বিলুপ্ত করে দিলে। মাঠের পরপারে দেখা গেল যুদ্ধক্ষেত্রের

অশ্বারোহী দূতের মতো ধুলার ধ্বজা উড়িয়ে বাতাস উন্মত্তভাবে ছুটে আসছে। আমাদের আশ্রমের শালতরুর শ্রেণী এবং তালবনের শিখরের উপরে একটা কোলাহল জেগে উঠল ; তারপরে দেখতে দেখতে আমবাগানের সমস্ত ডালে ডালে আন্দোলন পড়ে গেল—পাতায় পাতায় মাতামাতির কলমর্মরে আকাশ ভরে গেল—ঘনধারায় বৃষ্টি নেমে এল। তার পর থেকে এই চকিত বিদ্যুতের সঙ্গে থেকে থেকে মেঘের গর্জন, বাতাসের বেগ, এবং অবিরল বর্ষণ চলেছে। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে নিবিড় হয়ে এসেছে। আজ যে-সব কথা বলার প্রয়োজন আছে মনে করে এসেছিলুম সে-সব কথা কোথায় যে চলে গিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির খরতাপে চারি দিকের মাঠ শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, জল আমাদের ইঁদারার তলায় এসে ঠেকেছিল, আশ্রমের ধেনুদল ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। স্নান ও পানের জলের কি রকম ব্যবস্থা করা হবে সেজন্যে আমরা নানা ভাবনা ভাবছিলুম ; মনে হচ্ছিল যেন এই কঠোর শুষ্কতার দিনের আর কোনোমতেই অবসান হবে না।

এমন সময় এক সন্ধ্যার মধ্যেই নীল স্নিগ্ধ মেঘ আকাশ ছেয়ে ছড়িয়ে পড়ল—দেখতে দেখতে জলে একেবারে চারদিক ভেসে গেল। ক্রমে ক্রমে নয়, ক্ষণে ক্ষণে নয়—চিন্তা করে নয়, চেষ্টা করে নয়—পূর্ণতার আবির্ভাব একেবারে অবারিত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে অনায়াসে সমস্ত অধিকার করে নিলে।...

এই পরিপূর্ণতার প্রকাশ যে কেমন, সে যে কী বাধাহীন, কী প্রচুর, কী মধুর, কী গম্ভীর, সে আজ এই বৈশাখের দিবাবসানে সহসা দেখতে পেয়ে আমাদের সমস্ত মন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে ; আজ অন্তরে বাহিরে এই পরিপূর্ণতারই সে অভ্যর্থনা করেছে।" ['বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা', তদেব]

'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার সর্বত্র বীরভূমের উদাস রুক্ষ গৈরিক প্রকৃতির এই ধরনের বর্ণনা ছড়িয়ে আছে। জীবনের মধ্যবিন্দুতে উপনীত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যে গভীর অধ্যাত্ম-সাধনলোকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি তারই যোগ্য পটভূমি। কবিকল্পনার উপর নোতুন পরিবেষ্টনীর প্রভাব যে কত গভীর, তারই পরিচয় এখানে পাই। পরবর্তী পনেরো বৎসরে রচিত কাব্যধারায় (পূরবী-মহুয়া থেকে আরোগ্য-জন্মদিনে : ১৯১৫-৪১) এবং নাটকে, গানে, প্রবন্ধে, ভ্রমণবিবরণে শান্তিনিকেতন বার বার দেখা দিয়েছে।

গাজিপুর, পদ্মাতীর, বোলপুর : এই তিন প্রকৃতি-চিত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এই তিন চিত্রে পরস্পরের মধ্যে মিল নেই, কিন্তু প্রেরণার উৎসরূপে এই তিন দৃশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

যৌবনের সূচনায় গাজিপুরকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে গ্রহণ করেছিলেন। ঊনত্রিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সে-দেখা সেই গাজিপুর জীবনের শেষ প্রান্তে 'পুনশ্চ' ও 'আরোগ্য' কাব্যে ফিরে এসেছে। আর পদ্মাতীর, চর ও মধ্যবঙ্গের জনপদ তো বার বার রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছে। রাঢ়-বঙ্গের সন্ন্যাসী রুক্ষপ্রকৃতির প্রভাব পরবর্তীকালে আরও গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছে। পুনশ্চ-পরিশেষ-বীথিকা-বিচিত্রিতা-শেষ সপ্তক-পত্রপুট- শ্যামলী- প্রান্তিক- সেঁজুতি কাব্যধারা এই প্রভাবের পরিচয়স্থল।

কবি এই প্রকৃতি-দৃশ্যগুলিকে সমস্ত জীবন ধরে মনের মধ্যে সযত্নে লালন করেছেন। কিছুই তিনি হারাতে চাননি। মুগ্ধদৃষ্টির প্রদীপে কবি বার বার এদের আরতি করেছেন ; বলেছেন :

"মন বলে, এই আমার যত দেখার টুকরো
চাই নে হারাতে।
আমার সত্তর বছরের খেয়ায়
কত চলতি মুহূর্ত উঠে বসেছিল,
তারা পার হয়ে গেছে অদৃশ্যে।
তার মধ্যে দুটি-একটি কুঁড়েমির দিনকে
পিছনে রেখে যাব
ছন্দে-গাঁথা কুঁড়েমির কারুকাজে ;
তারা জানিয়ে দেবে আশ্চর্য কথাটি—
একদিন আমি দেখেছিলেম এই সব-কিছু।"

['দেখা', পুনশ্চ]

এর বেশি প্রত্যাশা কবির নেই। 'পুনশ্চ'-কাব্যের 'স্মৃতি' কবিতাটিতে চল্লিশ বৎসর পরে এবং 'আরোগ্য'-কাব্যের 'ঘণ্টা বাজে দূরে' কবিতাটিতে পঞ্চাশ বৎসর পরে গাজিপুরের মধ্যাহ্ন-দৃশ্যটি ফিরে এসেছে। প্রথম-যৌবনের সঙ্গী গাজিপুরের গঙ্গার চর আর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন নোতুন করে কবিকে মুগ্ধ করেছে। আর পদ্মার নির্জন চর, চলমান স্রোতের পটে আলোছায়ার খেলা আর পূর্ণিমা-বিভাবরীতে স্বপ্নসম তীরভূমি কবিকে পদ্মাপ্রেমী করে রেখেছে তাঁর

সমস্ত জীবন। কবি পদ্মাকে দেখেছেন চল্লিশ বৎসর পরে ; বলেছেন :

"পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে,
এক পারে বালুর চর,
নির্ভীক কেননা নিঃস্ব, নিরাসক্ত—
একদিন ছিলেম ওরই চরের ঘাটে,
নিভৃতে, সবার হতে বহু দূরে।
ভোরের শুকতারাকে দেখে জেগেছি,
ঘুমিয়েছি রাতে সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে
নৌকার ছাদের উপরে।
আমার একলা দিন রাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর উদাসীন ধারা—
... তার পরে যৌবনের শেষে এসেছি
তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে।
ছায়াবৃত সাঁওতাল-পাড়ার পুঞ্জিত সবুজ
দেখা যায় অদূরে।
এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।"
['কোপাই', পুনশ্চ]

প্রকৃতি-প্রেমী কবি এই সুন্দরী ধরণীর কাছ থেকে চিরবিদায় নেবার আগে মর্ত্যমমতার শেষ স্বাক্ষর রেখে গেছেন 'আরোগ্য'-কাব্যের 'ঘণ্টা বাজে দূরে' কবিতাটিতে (৩১শে জানুয়ারি ১৯৪১, শান্তিনিকেতন)। কবিজীবনে যে তিনটি প্রকৃতি-দৃশ্য গানের ধুয়ার মতো ফিরে ফিরে এসেছে—সেই গাজিপুর, পদ্মাতীর ও বোলপুরের প্রকৃতি-আলেখ্য শেষবারের মতো দেখে নিয়েছেন। এ-কারণে এই কবিতাটি বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। এটির মধ্য দিয়ে সারাজীবনের প্রকৃতি-প্রেম ও তার প্রভাবের সানুরাগ অঙ্গীকার শেষবারের মতো কবি রেখে গেছেন। মৃত্যুর সিংহদ্বারে উপনীত হয়ে সুগভীর মর্ত্যমমতা ও নির্মম নিরাসক্তি, দুয়েরই স্বীকৃতি কবি এখানে জানিয়েছেন ; বলেছেন :

"পথে চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর

চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে ;
এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।"

কবির মনে পড়ে—

"পশ্চিমের গঙ্গাতীর, শহরের শেষপ্রান্তে বাসা ;
দূরপ্রসারিত চর
শূন্য আকাশের নীচে শূন্যতার ভাষ্য করে যেন।"

মনে পড়ে—

"সেই বহুদিন আগে,
দু-পহর রাতি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।
জ্যোৎস্নায় চিক্কণ জল,
ঘনীভূত ছায়ামূর্তি নিষ্কম্প অরণ্য তীরে-তীরে,
ক্বচিৎ বনের ফাঁকে দেখা যায় প্রদীপের শিখা
সহসা উঠিনু জেগে।
শব্দশূন্য নিশীথ-আকাশে
উঠিছে গানের ধ্বনি তরুণ কণ্ঠের ;
ছুটিছে ভাঁটির স্রোতে নৌকা খরতর বেগে।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল—"

'সংসারের প্রান্ত-জানালায়' বসে এইসব ছবি কবির চোখে পড়েছে—মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত-জীবন-পরিক্রমান্তে ফিরে এসেছেন শান্তিনিকেতনের উদার প্রান্তে, যেখানে—

"দিগন্তের নীলিমায় চোখে পড়ে অনন্তের ভাষা।
আলো আসে ছায়ায় জড়িত
শিরীষের গাছ হতে শ্যামলের স্নিগ্ধ সখ্য বহি।"

[সংসারের প্রান্ত-জানালায়', আরোগ্য]

মর্ত্যমমতার Last Testament রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গিয়েছেন এই কাব্যের 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি' কবিতায়। জীবনের সমস্ত শোক দুঃখ, আঘাত বেদনা

ক্ষয় ক্ষতি, কীর্তি সাফল্য,—সব-কিছুর উপরে জয়লাভ করেছে কবির সুগভীর ধরণী-প্রীতি, এতেই কবি জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে পেয়েছেন। এ প্রেমের, এ উপলব্ধির, এ আনন্দের ক্ষয় নেই—এই মন্ত্রবাণী জীবনে তাঁর সত্য হয়ে উঠেছিল। আনন্দকম্পিত কণ্ঠে কবির এই ঘোষণাই আমাদের পরম প্রাপ্তি ঃ

"শেষস্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, 'তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে ;
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ ধূলার রাখিনু প্রণতি।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বোলপুরের প্রকৃতি তাই অমর হয়ে রইল।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ পুরুষ, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য-সাধনার যে সম্পদ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তার যোগফল অপেক্ষা রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্য বেশি, এ-কথা নিরপেক্ষ রসিক পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন। এক এক সময় ভাবি যদি রবীন্দ্রনাথ না থাকতেন তা হলে বাংলা সাহিত্যের অবস্থাটা কী দাঁড়াত ? বস্তুত আমরা রবীন্দ্রসাহিত্য-ক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ হয়েছি, লালিত হয়েছি এবং বেড়ে উঠেছি ; বিশ্বের দরবারে জোর করে বলতে পেরেছি—'বাঙ্গালী আজ গানের রাজা, বাঙ্গালী নহেক' খর্ব'। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণ কতদূর, সে-কথা অগ্রণী কবি শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন : "রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সক্রিয় তথা সর্বতোমুখ সাহিত্যিক বাংলাদেশে ইতিপূর্বে জন্মান নি এবং পরবর্তীরা আত্মশ্লাঘায় যতই প্রাগ্রসর হোক না কেন, অনুভূতির রাজ্যে সুদ্ধ তারা এমন কোনও পথের সন্ধান পায়নি যাতে রবীন্দ্রনাথের পদচিহ্ন নেই। বস্তুত তাঁর দ্বিগ্বিজয়ের পরে বাংলা সাহিত্যের যে অবস্থান্তর ঘটেছে তা এই : তাঁর অসীম সাম্রাজ্যের অনেক জমি জোতদারদের দখলে এসেছে ; এবং তাদের মধ্যে যারা পরিশ্রমী, তারা নিজের নিজের এলাকায় শস্যের পরিমাণ বাড়িয়েছে মাত্র। ফসলের জাত বদ্‌লাতে পারে নি!" [—'কুলায় ও কালপুরুষ', পৃঃ ৮]। বাংলা সাহিত্যের সিদ্ধিদাতা পুরুষ রূপেই রবীন্দ্রনাথ আগামী একবিংশ শতাব্দে স্বীকৃত হবেন, এ-কথা বলা যেতে পারে। বিচার্য এই : হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ধারাটিকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গ্রহণ করেছেন ? প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের কাছে তাঁর ঋণ কতটা ? তাঁকে প্রাচীন সাহিত্যের কোন্ অঙ্গ মুগ্ধ করেছে ?

এ সম্বন্ধে ভেবে দেখলে মনে হয়, বৈষ্ণব কবিতা ও লোকসংগীত ছাড়া প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের আর কোনো শাখা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আকৃষ্ট করতে পারে নি। অথচ রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্য—বিশেষ করে বাল্মীকি ও কালিদাস এবং ইংরেজি সাহিত্য—বিশেষ করে রোমান্টিক

রিভাইভাল্ পর্বের কাব্যসাধনার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিমুখতার কারণ আলোচনা করলে রবীন্দ্রচরিত্রের উপরে নোতুন ভাবে আলোক সম্পাত করা যেতে পারে বলে' আমার ধারণা।

বাংলা সাহিত্য রসপরিণতি লাভ করে পাশ্চাত্ত্য প্রেরণায়, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন; তার আগে বাংলা সাহিত্যের নাবালকত্ব ঘোচেনি বলেই তাঁর ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ এই পাশ্চাত্ত্য প্রেরণা প্রসঙ্গে বলেছেন: "ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মতো আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে, সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাইল। এই বাস্তবকে যে লোক ভয় করে, যে লোক বাঁধা নিয়মের শিকলটাকেই শ্রেয় বলিয়া জানে, তাহারা ইংরেজই হউক আর বাঙালিই হউক, এই শিক্ষাকে ভ্রম এবং এই জাগরণকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিবার ভাণ করিতে থাকে। তাহাদের বাঁধা তর্ক এই যে, এক দেশের আঘাত আর এক দেশকে সচেতন করে না। কিন্তু দূর দেশের দক্ষিণে হাওয়ায় দেশান্তরে সাহিত্যকুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। যেখান হইতে হউক, যেমন করিয়াই হউক, জীবনের আঘাতে জীবন জাগিয়া উঠে, মানবচিত্ততত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।" [বাস্তব—'সাহিত্যের পথে']।

বিশুদ্ধ স্বদেশী সাহিত্য ও খাঁটি বাঙালি কবিত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তা এই কথায় বোঝা যায়। সাহিত্যে বিদেশী প্রভাবের অনুযোগ যাঁরা তোলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ভর্ৎসনা করে বলেছেন, "বর্তমান যুগে য়ুরোপ সর্ববিধ বিদ্যায় ও সর্ববিধ কলায় মহীয়ান। চারিদিকে তার প্রভাব নানা আকারে বিকীর্ণ। এই প্রভাবের প্রেরণায় য়ুরোপের বহির্ভাগেও দেশে দেশে চিত্তজাগরণ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণকে নিন্দা করা অবিমিশ্র মূঢ়তা। য়ুরোপ যে-কোনো সত্যকে প্রকাশ করেছে তাতে সকল মানুষেরই অধিকার। কিন্তু সেই অধিকারকে আত্মশক্তির দ্বারাই প্রমাণ করতে হয়, তাকে স্বকীয় করে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চাই। আমাদের স্বদেশানুভূত, আমাদের সাহিত্যে য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত। বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা। শরৎ চাটুজ্জের গল্প, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, হাতেম-তাই, গোলেবকাওয়ালি অথবা কাদম্বরী-বাসবদত্তার মতো যে হয় নি,

হয়েছে য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের ছাঁদে, তাতে করে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণ হয় না। তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা। বাতাসে সত্যের যে প্রভাব ভেসে বেড়ায় তা দূরের থেকেই আসুক বা নিকটের থেকে, তাকে সর্বাগ্রে অনুভব করে এবং স্বীকার করে প্রতিভাসম্পন্ন চিত্ত; যাঁরা নিষ্প্রতিভ তারাই সেটাকে ঠেকাতে চায়, এবং যেহেতু তারা দলে ভারী এবং তাদের অসাড়তা ঘুচতে অনেক দেরী হয় এই কারণেই প্রতিভার ভাগ্যে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ থাকে। তাই বলি, সাহিত্যবিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণসংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।" [সাহিত্য বিচার—'সাহিত্যের পথে']।

আশা করি এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির পর আর বিশ্লেষণের অপেক্ষা থাকে না যে, রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য প্রেরণাকে সাগ্রহে সমস্ত অন্তর দিয়েই গ্রহণ করেছিলেন।

॥ ২ ॥

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিচার নানা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ করেছেন। এই বিচারের সূত্রটি কবি নিজেই উপস্থিত করেছেন,—"আমরা সহজেই ভুলি যে, জাতিনির্ণয় বিজ্ঞানে, জাতির বিবরণ ইতিহাসে, কিন্তু সাহিত্যে জাতিবিচার নেই, আর আর সমস্তই ভুলে ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে হবে।...নীলনদীর তীর থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু যথা-সময়ে সে হয় ভারতেরই বর্ষা। তাতে ভারতের ময়ূর যদি নেচে ওঠে তবে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত স্বাদেশিক তাকে যেন ভর্ৎসনা না করেন—যদি সে না নাচত তবেই বুঝতুম, ময়ূরটা মরেছে বুঝি।" [সাহিত্য বিচার— 'সাহিত্যের পথে']।

সাহিত্যপ্রেরণার ভূগোল নেই এবং সাহিত্যরচনার জাতিবিচার নেই— এখান থেকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-দর্শনের সূচনা।

রবীন্দ্রনাথ প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধর্মকলহের ও আধ্যাত্মিক অরা-জকতার মূল সন্ধান করেছেন বৌদ্ধযুগের পরবর্তী ভারতবর্ষে। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের আলোচনায় তিনি মন্তব্য করেছেন, "এক কালে ভারতবর্ষে প্রবলতাপ্রাপ্ত অনার্যদের সহিত ব্রাহ্মণ-প্রধান

আর্যদের দেবদেবী ক্রিয়াকর্ম লইয়া এই-যে বিরোধ বাধিয়াছিল সেই বহু-কালব্যাপী বিপ্লবের মৃদুতর আন্দোলন সেদিন পর্যন্ত বাংলাকেও আঘাত করিতেছিল, দীনেশবাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পড়িলে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।" [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—'সাহিত্য']।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে 'মেয়ে-দেবতার' প্রবল প্রতাপ ও যথেচ্ছাচার প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে উচ্চতর ভাব বা সাহিত্যকর্ম আশা করে লাভ নেই, একথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। শিবের বিরুদ্ধে শক্তির লড়াই মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু ; এই লড়াই বিদ্রোহের ঝড়, নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধের প্রচণ্ডতর ঝড় রূপে দেখা দিয়েছিল। মঙ্গলকাব্যসাহিত্য শক্তির উপাসনা ও বন্দনামূলক সাহিত্য ; এর জোর ভয়ের জোর, ছলনার জোর, প্রতিহিংসার জোর। "কিন্তু কী আধ্যাত্মিক, কী আধিভৌতিক, ঝড় কখনোই চিরদিন থাকতে পারে না।...তখনকার নানাবিভীষিকাগ্রস্ত পরিবর্তনব্যাকুল দুর্গতির দিনে শক্তিপূজারূপে এই-যে প্রবলতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের মনুষ্যত্বকে চিরদিন পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে না। যে ফলের মিষ্ট হইবার ক্ষমতা আছে সে প্রথম অবস্থার তীব্র অম্লত্ব পক্ক অবস্থায় পরিহার করে। যথার্থ ভক্তি সুতীব্রকঠিন শক্তিকে যদি বা প্রাধান্য দেয় শেষকালে তাহাকে উত্তরোত্তর মধুর কোমল ও বিচিত্র করিয়া আনে। বাংলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশ মাতা অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মী রূপে, বিচ্ছেদ-বিধুর পিতামাতার কন্যারূপে—মাতা পত্নী ও কন্যা রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গলসুন্দর রূপে—দরিদ্র বাঙালির ঘরে রসসঞ্চার করিয়াছেন।" [তদেব]

মঙ্গলকাব্যের উপর বৈষ্ণব কাব্যের জয় প্রমাণিত হল, "ভক্তির পথ কখনোই প্রচণ্ডতার মধ্যে গিয়া থামিতে পারে না ; প্রেমের আনন্দেই তাহার অবসান হইতে হইবে।...চণ্ডীপূজা ক্রমে যখন ভক্তিতে স্নিগ্ধ ও রসে মধুর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন তাহা মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করিয়া খণ্ড খণ্ড গীতে উৎসারিত হইল।" [তদেব]

এই আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, রবীন্দ্রনাথ শাক্ত মঙ্গলকাব্যকে ভৎর্সনা করেছেন, শাক্তপদাবলী ও বৈষ্ণবপদাবলীকে অনুরাগের সংগে গ্রহণ করেছেন। 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্য', 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে এই অনুরাগের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

বৈষ্ণব কবিতার উৎকর্ষ দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বৈষ্ণবধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি; সে শক্তি বলরূপিণী নহে, প্রেমরূপিণী।...এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা, সমস্ত বিচিত্র ও নূতন।...বাংলাদেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণবযুগে।" [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—'সাহিত্য']।

এরপরে রবীন্দ্রনাথ একটি গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। বৈষ্ণবপদাবলীর আবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাস স্থায়ী হল না কেন? তিন শতাব্দের জীবনে প্রেরণানিঃশেষিত হয়ে ব্যর্থ অনুকরণের মরুবালুতে শুষ্কতায় পর্যবসিত হল কেন? "কারণ এই যে ভাবসৃজনের শক্তি প্রতিভার, কিন্তু ভাব রক্ষা করিবার শক্তি চরিত্রের। বাংলা দেশে ক্ষণে ক্ষণে ভাববিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার পরিণাম দেখিতে পাই না। ভাব আমাদের কাছে সম্ভোগের সামগ্রী, তাহা কোনো কাজের সৃষ্টি করে না, এইজন্য বিকারেই তাহার অবসান হয়।" [তদেব]। অনুরূপ কথা কবি অন্যত্রও বলেছেন, "আমাদের সাহিত্যে ভোজের আয়োজন পনের আনা, শক্তির আয়োজন এক আনা।" ['শিক্ষার বিকিরণ']।

"বঙ্গসাহিত্যে দুর্গা ও রাধাকে অবলম্বন করিয়া দুই ধারা দুই পথে গিয়াছে; প্রথমটি গেছে বাংলার গৃহের মধ্যে, আর দ্বিতীয়টি গেছে বাংলার গৃহের বাইরে। কিন্তু এই দুইটি ধারারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রমণী এবং এই দুইটিরই স্রোত ভাবের স্রোত।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—'সাহিত্য')। ভাবের স্রোতকে স্থায়ী করার মতো চরিত্রশক্তির অভাব আছে বলেই সেদিন এই দুই ধারা স্থায়িত্ব অর্জন করেনি, মহত্ত্বে উন্নীত হয় নি। 'দুঃখক্লেশকে ভাঙিয়ে ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা' গড়ার কাজে মানবচিত্তের সকরুণ বেদনা আছে বটে, কিন্তু তা সাহিত্যকে তার বিশেষ দেশকালের বাইরে নিয়ে যেতে পারে না, এজন্যই না মানবমুক্তির বাহক হতে পারে নি।

বাংলার সাহিত্যে এই চরিত্র ও পৌরুষের পরাজয়, মেয়ে-দেবতার বিজয় এবং ভাবোচ্ছ্বাস অসংযত বিস্তারকে রবীন্দ্রনাথ বার বার ভৎর্সনা করেছেন।

বাংলার গ্রাম্যছড়া, রাধাকৃষ্ণ ও শিবদুর্গা-বিষয়ক ছড়ার আলোচনায় এই ধারণার সমর্থন পাই।

রবীন্দ্রনাথ কঠোর তিরস্কার করেছেন এই কথায়—"বাংলার গ্রাম্যছড়ায় হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণের কথা ছাড়া সীতা-রাম ও রাম-রাবণের কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা তুলনায় স্বল্প। একথা স্বীকার করিতেই হইবে, পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণ-কথাই সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চা অধিক। আমাদের দেশে হরগৌরী-কথায় স্ত্রী-পুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণ-কথায় নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধ নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার প্রসার সংকীর্ণ, তাহাতে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্যবৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় হৃদয়বৃত্তির চর্চা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই। তাহাতে বীরত্ব, মহত্ত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগ স্বীকারের আদর্শ নাই। রামসীতার দাম্পত্য আমাদের দেশ-প্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতরগুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং বিশুদ্ধ; তাহা যেমন কঠোর গম্ভীর তেমনি স্নিগ্ধ কোমল। রামায়ণকথার একদিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য, অপর দিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য, একত্র সম্মিলিত।··· সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমনি শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যে নাই। বাংলা দেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।" [গ্রাম্য-সাহিত্য—'লোক-সাহিত্য']।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে যে নারীস্বভাব ক্রন্দনশীল রামচন্দ্রকে পাই, তিনি 'নরোত্তম পুরুষশ্রেষ্ঠ' বলে মনে হবার কোনো কারণ নেই। কৃত্তিবাসী রামায়ণকে জাতীয় কাব্য বলা হয়—বাঙালী জাতির ক্রন্দনশীলতা, নমনীয়তা ঔদারিকতা, অশ্লীলতাপ্রীতি, ভীরুতা, হীনতা, চাটুকারিতা, অনৈক্য—সবই কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত রামায়ণে ও অপরাপর রামায়ণকাব্যে আছে। তা থেকে শিক্ষা পাবার মত বিশেষ কিছু নেই। বাংলার রামায়ণ-মহাভারত, মঙ্গলকাব্যের মেয়ে-দেবতার হীন ষড়যন্ত্র ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার অসংযত

হৃদয়োচ্ছ্বাস—এগুলি রবীন্দ্রনাথের অভিমতকে সমর্থন করে—আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে চরিত্রের শোচনীয় অভাব ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের উপরিক্ত মন্তব্য নতমস্তকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নাই।

॥ ৩ ॥

প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে আছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য এবং কবিগান। রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালা, দুই পক্ষকেই ভর্ৎসনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন, "রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।" (কবি সংগীত), তথাপি এ'কথাও বলেছেন, "বিদ্যাসুন্দরের কবি সমাজের বিরুদ্ধে যথার্থ অপরাধী। সমাজের প্রাসাদের নীচে তিনি হাসিয়া হাসিয়া সুরঙ্গ খনন করিয়াছেন। সে সুরঙ্গ মধ্যে পূত সূর্যালোক এবং উন্মুক্ত বায়ুর প্রবেশপথ নাই। তথাপি এই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রার এত আদর আমাদের দেশে কেন? উহা অত্যাচারী কঠিন সমাজের প্রতি মানবপ্রকৃতির সুনিপুণ পরিহাস।" ('গ্রাম্য সাহিত্য'—'লোকসাহিত্য')।

রবীন্দ্রনাথ কঠিনতম ভর্ৎসনাবাক্য উচ্চারণ করেছেন কবিগানের প্রতি। তর্জা, খেউড়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, দাঁড়া-কবি প্রমুখ কবি সংগীতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। কবিগানের অগভীরতা ও লঘুতাকে রবীন্দ্রনাথ ক্ষমা করেন নি এবং একে পাস-মার্কা দিতে রাজী ছিলেন না। সেজন্যই তিনি মন্তব্য করেছেন, "উপস্থিত মত সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার ভার লইয়া কবিদলের গান ছন্দ এবং ভাষার বিশুদ্ধি ও নৈপুণ্য বিসর্জন দিয়া কেবল সুলভ অনুপ্রাস ও ঝুটা অলংকার লইয়া কাজ সারিয়া দিয়াছে; ভাবের কবিত্ব সম্বন্ধেও তাহার মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না। পূর্ববর্তী শাক্ত ও বৈষ্ণব মহাজনদিগের ভাবগুলিকে অত্যন্ত তরল এবং ফিকা করিয়া কবিগণ শহরের শ্রোতাদিগকে সুলভ মূল্যে যোগাইয়াছেন। তাঁহাদের যাহা সংযত ছিল এখানে তাহা শিথিল এবং বিকীর্ণ।......আমাদের কবিওয়ালারা

বৈষ্ণব কাব্যের সৌন্দর্য এবং গভীরতা নিজেদের এবং শ্রোতাদের আয়ত্তের অতীত জানিয়া প্রধানত যে অংশ নির্বাচিত করিয়া লইয়াছেন তাহা অতি অযোগ্য। কলঙ্ক এবং ছলনা ইহাই কবিওয়ালাদের গানের প্রধান বিষয়। বারম্বার রাধিকা এবং রাধিকার সখীগণ কুব্জাকে অথবা অপরাকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র সরস পরিহাসে শ্যামকে গঞ্জনা করিতেছেন। তাঁহাদের আরও একটি রচনার বিষয় আছে, স্ত্রী পক্ষ এবং পুরুষ-পক্ষের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস-প্রকাশ-পূর্বক দোষারোপ করা; সেই শখের কলহ শুনিতে শুনিতে ধিক্কার জন্মে।" [কবিসংগীত, 'লোকসাহিত্য']। তিনি আরও বলেছেন, "বাংলাদেশেই এমন মন্তব্য শুনতে হয়েছে যে, দাশুরায়ের পাঁচালি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তা বিশুদ্ধ স্বাদেশিক। এটা অন্ধ অভিমানের কথা।" [সাহিত্যবিচার—'সাহিত্যের পথে']।

কবিগান ও পাঁচালীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো দুর্বলতা ছিল না। কোনো কোনো মহল থেকে এগুলিকে বিশুদ্ধ জাতীয় সাহিত্যসম্পদ বলে চালাবার ও উচ্ছ্বসিত হবার যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, তা এখানে ধিকৃত হয়েছে।

এই নিম্ন রুচি ও শব্দচাতুরি যেখানে দেখা যায় সেখানেই সাহিত্য গুণের শোচনীয় অভাব ঘটে, একথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। আর সেই কারণেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকেও ধিক্কার দিয়েছেন। ঈশ্বর গুপ্ত সেকালের সাহিত্যের প্রথম ডিক্টেটার ছিলেন, 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকা মারফৎ আধুনিক সাহিত্যের প্রথম পর্বকে তিনি চালনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু ও মনোমোহন বসু তাঁর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র গুরু-প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করেছিলেন। এজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলেছেন, "বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে-সময়কার সাহিত্য অন্য যে-কোনো প্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক, ঠিক সুরুচিশিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে সময়কার অসংযত বাক্‌যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা যে কী আশ্চর্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতার প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই শুচিতা দেখা

যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।" [বঙ্কিমচন্দ্র—"আধুনিক সাহিত্য"]।

সাহিত্যে নিম্নরুচি ও শস্তা মনোরঞ্জন-বিদ্যাকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন সমর্থন করেন নি, এইজন্যই মঙ্গলকাব্যে কবিকুল, কবিওয়ালা, ঈশ্বরগুপ্ত ও দীনবন্ধুকে প্রশংসা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

॥ ৪ ॥

রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনায় মনকে সব রকম যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের হাত থেকে মুক্তি দিতে সচেষ্ট ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দেখাতে গিয়ে তিনি সেই বুদ্ধির উদ্বোধনের ধারাটি দেখিয়েছেন। তথাকথিত 'ন্যাশনাল' সাহিত্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। যেখানে বুদ্ধির মুক্তি ও মনের স্বাধীনতাকে পেয়েছেন, সেখানে তিনি সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছেন। ভাব-সৃজনের শক্তিই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে চাই রক্ষা করার শক্তি। এই শক্তির আধার চরিত্র। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই চরিত্রের শোচনীয় অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে ব্যথিত হয়েছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্য আধুনিক বলে নয়, চরিত্রবলে ও স্বীকরণ-ক্ষমতায় বলীয়ান বলেই রবীন্দ্রনাথ তাকে গ্রহণ করেছেন। এই শক্তিকেই তিনি প্রতিভা বলে মনে করেন আর তা পেয়েছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিতে। তাই কেবল এই চারজনকেই তিনি স্বীকার করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের ক্রম বিকাশের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে আমাদের চিত্তক্ষেত্রে সংস্কারমুক্ত বুদ্ধির প্রকাশ ঘটেছে, সেজন্যই তা অভ্যর্থনীয়। ইংরেজ শক্তি এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের ফলে বর্তমান কালের সঙ্গে বাংলাদেশের সংযোগ স্থাপিত হওয়াকে তিনি শুভকর বলে মনে করেছেন।

ইংরেজ রাজ্যবিস্তার "উপলক্ষে বর্তমান যুগের বেগবান চিত্তের সংস্রব ঘটল বাংলাদেশে। বর্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ এই যে, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় বদ্ধ বা ব্যক্তিগত মূঢ় কল্পনায় জড়িত নয়। কি বিজ্ঞানে কি সাহিত্যে, সমস্ত দেশে সমস্ত কালে তার ভূমিকা। ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা সর্বমানব চিত্তের সঙ্গে মানসিক দেনা-পাওনার

ব্যবহার প্রশস্ত করে চলেছে।......পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতঃই স্বীকার করে নিচ্ছি। এই ইচ্ছাকৃত অঙ্গীকারের স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনতা, চিত্তলোকে এর সর্বত্রগামিতা—নানা ধারায় এর অবাধ প্রবাহ। এর মধ্যে নিত্য উদ্যমশীল বিকাশধর্ম নিয়ত উন্মুখ, কোনো দুর্গম্য কঠিন নিশ্চল সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে স্থবিরভাবে বদ্ধ নয়, রাষ্ট্রীক ও মানসিক স্বাধীনতার গৌরবকে এ ঘোষণা করেছে—সকলপ্রকার যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্যে এর প্রয়াস।......এই সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল। এ নিয়ে বাঙালি যথার্থই গৌরব করতে পারে।......চিত্তসম্পদকে সংগ্রহ করার অক্ষমতাই বর্বরতা, সেই অক্ষমতাকেই মানসিক আভিজাত্য বলে যে মানুষ কল্পনা করে সে কৃপাপাত্র।" [বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ—'সাহিত্যের পথে']

সত্যের কোনো জিওগ্রাফি নেই, শিল্পপ্রেরণার কোনো সংকীর্ণ সীমা নেই, তাই পশ্চিমী সংস্কৃতির সত্য ও সাহিত্যের প্রেরণা আমাদের পক্ষ থেকে যাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাঁরা নমস্য। রবীন্দ্রনাথ যে চারজন বাঙালির মধ্যে পশ্চিমের চিত্তসম্পদ্‌কে আপন বলে স্বীকার করার ক্ষমতা লক্ষ্য করেছিলেন, এবার তাঁদের কথায় আসা যাক্।

নূতন-সাহিত্যরস-সম্ভোগের সহজ শক্তি ও নবতর সৃষ্টির পরিচয় প্রথম আমরা পাই রামমোহন রায়ের রচনায়। "সেদিন তিনি যে বাংলা ভাষায় ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হলেন সে ভাষার পূর্ব পরিচয় এমন কিছুই ছিল না যাতে করে তার উপরে এত বড়ো দুরূহভার অর্পণ সহজে সম্ভবপর মনে হতে পারত। বাংলাভাষায় তখন সাহিত্যিক গদ্য সবে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, নদীর তটে সদ্যশায়িত পলিমাটির স্তরের মতো, এই অপরিণত গদ্যেই দুর্বোধ তত্ত্বালোচনায় ভারবহ ভিত্তি সংঘটন করতে রামমোহন কুণ্ঠিত হলেন না। এই যেমন গদ্যে, পদ্যে তেমনি অসম সাহস প্রকাশ করলেন মধুসূদন।" [তদেব]

পরের প্রেরণা ও চিত্তসম্পদকে আপন করে নেবার বিস্ময়কর ক্ষমতার দ্বিতীয় প্রমাণ বিদ্যাসাগর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।" [বিদ্যাসাগর চরিত—'চারিত্রপূজা']।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর—এই দুই চরিত্রের অনন্যতন্ত্রতা ও অন্তরঙ্গ মনুষ্যত্বের জন্য রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন; আর কোনো তৃতীয় বাঙালি এই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেন নি। প্রতিভা অপেক্ষা মনুষ্যত্ব বড়ো, কেননা প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো, আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর এই বিরল মনুষ্যত্বের অধিকারী বলে, রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল (দ্রঃ—বিদ্যাসাগর চরিত—'চারিত্রপূজা')।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এই: "তাঁহার প্রধানকীর্তি বঙ্গভাষা।......বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।...বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষায় উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাতে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কারও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর হয় ।" রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে (তদেব)

মধুসূদনের কাব্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের সূচনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন; তাই বলেছেন, "আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য সুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে নয়। পূর্বকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্তেই নূতন পন্থা নিয়েছিলেন।" (সাহিত্যরূপ—'সাহিত্যের পথে')। পুনশ্চ, "আমি জানি, এখনও আমাদের দেশে এমন মানুষ পাওয়া যায় যারা সেই পুরাতন কালের অনুপ্রাসকণ্টকিত শিথিল ভাষার পৌরাণিক পাঁচালি প্রভৃতি গানকেই বিশুদ্ধ ন্যাশনাল সাহিত্য আখ্যা দিয়ে আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রতিকূল কটাক্ষপাত করে থাকেন।...নবযুগের প্রাণবান সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নব-প্রভাতে উদ্বোধিত হল অমনি মধুসূদনের প্রতিভা তখনকার বাংলাভাষার পায়ে-চলা পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা বলে মনে করলে না। আপন শক্তির 'পরে শ্রদ্ধা ছিল বলেই বাংলাভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতায় দীক্ষা দিলেন যা তার পূর্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।" (বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ—'সাহিত্যের পথে)।

রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন যে রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান মাত্র, তার রূপটাই চরম। শিল্পের দিক থেকে বিচারের সময় আমরা রূপটাকেই দেখি। বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে ইতিহাসে অর্থনীতিতে। কিন্তু রূপের গৌরব রস-সাহিত্যে। মাইকেল বাংলা কাব্যে একটি রূপের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, সেইজন্যেই মধুসূদনের মহাকাব্যকে রবীন্দ্রনাথ নোতুন যুগের প্রবর্তক বলে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। বঙ্কিম সম্পর্কে কবি বলেছেন, "তিনি গল্পসাহিত্যের এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিলেন। বিজয়বসন্ত বা গোলেবকাওলির যে চেহারা ছিল সে চেহারা আর রইল না। তাঁর পূর্বেকার গল্পসাহিত্যের ছিল মুখোশ-পরা রূপ। তিনি সেই মুখোশ ঘুচিয়ে দিয়ে গল্পের একটি সজীব মুখশ্রীর অবতারণা করলেন। হোমার বর্জিল মিল্‌টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের কাছ থেকে মাইকেল তাঁর সাধনার পথে উৎসাহ পেয়েছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রও কথাসাহিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চাত্য লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু এঁরা অনুকরণ করেছিলেন বললে জিনিসটাকে সংকীর্ণ করে বলা হয়। সাহিত্যের কোনো একটি প্রাণবান রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই রূপটিকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।" (সাহিত্যরূপ—'সাহিত্যের পথে')। পুনশ্চ, "একথা মানতেই হবে, বঙ্কিম তাঁর নভেলে আধুনিক রীতিরই রূপ ও রস এনেছিলেন। তাঁর ভাষা পূর্ববর্তী প্রাকৃত বাংলা ও সংস্কৃত বাংলা থেকে অনেক ভিন্ন। তাঁর রচনার আদর্শ, কি বিষয়ে কি ভাবে কি ভঙ্গিতে, পাশ্চাত্যের আদর্শের অনুগত তাতে কোন সন্দেহ নেই।...এই নব্য রচনারীতির ভিতর দিয়ে সেদিনকার বাঙালি-মন মানসিক চিরাভ্যাসের অপ্রশস্ত বেষ্টনকে অতিক্রম করতে পারলে—যেন অসূর্যম্পশ্যরূপা অন্তঃপুরচারিণী আপন প্রাচীরঘেরা প্রাঙ্গণের বাইরে এসে দাঁড়াতে পেরেছিল। এই মুক্তি সনাতন রীতির অনুকূল না হতে পারে; কিন্তু সে যে চিরন্তন মানবপ্রকৃতির অনুকূল, দেখতে দেখতে তার প্রমাণ পড়ল ছড়িয়ে। এমন সময়ে বঙ্গদর্শন মাসিকপত্র দেখা দিল। তখন থেকে বাঙালির চিত্তে নব্য বাংলাসাহিত্যের অধিকার দেখতে দেখতে অবারিত হ'ল সর্বত্র।" (বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ—'সাহিত্যের পথে')।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত আশা করি এতক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে যে, সংকীর্ণ 'ন্যাশনাল'

সাহিত্যের বেড়া ভেঙে বৃহত্তর মানবসংসারের সঙ্গে যোগস্থাপনের কৃতিত্ব এই চারজন মনীষীর ছিল এবং এখানেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শুভ সূচনা হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি বাঙালি চিত্তের অনুরাগ, স্বেচ্ছাকৃত অঙ্গীকার ও আত্মীকরণ প্রমাণ করে যে, উনিশ শতকের বাঙালির প্রতিভা নিজেকে সার্থক করে তুলতে পেরেছে। সাহিত্যে বাঙালির মন বহুকালের আচারসংকীর্ণতা ও অভ্যাসের দাসত্ব থেকে যে এত শীঘ্র মুক্তিলাভ করেছিল, তাতে বাঙালির চিৎশক্তির অসামান্যতাই প্রমাণিত হয় বলে' রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দেখাতে গিয়ে বুদ্ধির উদ্বোধনের ধারাটি দেখিয়েছেন ; সাহিত্যের তালিকা তৈরি না করে বাঙালি চিত্তের নবজাগরণের মর্মকথাটিকে তুলে ধরেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় রবীন্দ্রকৃত ভাষ্য আমাদের পথনির্দেশক হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের মৌল প্রেরণা কি? কোন্ দুর্দম আবেগের বলে দীর্ঘ ষাট বৎসর ধরে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য রচনা করে গেছেন? কী সেই আন্তর তাগিদ যা রবীন্দ্রনাথকে বিচিত্র মানবসংসারে দেশে দেশে একাল ও সেকালের সাহিত্য সংসারে নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়েছে? আর তার সঙ্গে রবীন্দ্র-কৃত সাহিত্যতত্ত্বালোচনার যোগ কোথায়? এই সব প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা কেবল রবীন্দ্র-কৃত সাহিত্য ব্যাখ্যায় অন্বেষণ করি, তাহলে ভুল করব। সে উত্তর রবীন্দ্র-সাহিত্যেই অন্বেষণ করতে হবে। কবি নিজেই বলেছেন,—

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।···
প্রকৃতির ঐকতান স্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে—
তাদের সবার সাথে আছে মোর এই মোর যোগ,
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ;
গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ—
নিখিলের সংগীতের স্বাদ। [ঐকতান, জন্মদিনে]

পৃথিবীর কবি, সংসারের কবি, মানুষের কবি—এই পরিচয়টি অক্ষয় হয়ে থাক, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের কামনা। এর চেয়ে অধিকতর সত্য কোনো পরিচয় তিনি কামনা করেন নি। বসুধার কাছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-ব্যাপী সাধনার ফল নিবেদন করে বলেছেন,—

সে মানুষ, হে ধরণী,
তোমার আশ্রয় ছেড়ে যাবে যবে, নিয়ো তুমি গণি
যা-কিছু দিয়েছ তারে, তোমার কর্মীর যত সাজ,
তোমার পথের যে পাথেয়; তাহে সে পাবে না আজ;
রিক্ততায় দৈন্য নহে। তবু জেনো, অবজ্ঞা করি নি

তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী—
জানায়েছি বারম্বার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান।

[জন্মদিন, সেঁজুতি]

রবীন্দ্রনাথের এই পরিচয়টি মনে না রাখলে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যশাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথ, উভয়কেই ভুল বোঝার আশংকা আছে; এই সুগভীর মর্ত্যমমতা ও মানবপ্রেম রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল সুর। এছাড়া অন্য কোনো পরিচয়ই সত্য নয়। এ কথাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যতত্ত্বালোচনায় বারবার বলেছেন। বন্ধুবর লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লিখিত এক পত্রে কবি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না আমরা জ্ঞানতঃ কিংবা অজ্ঞানতঃ মানুষকেই সবচেয়ে বেশি গৌরব দিয়ে থাকি? আমরা যদি কোনো সাহিত্যে অনেকগুলো ভ্রান্ত মতের সঙ্গে একটা জীবন্ত মানুষ পাই সেটাকে কি চিরস্থায়ী করে রেখে দিই নে? জ্ঞান পুরাতন এবং অনাদৃত হয়, কিন্তু মানুষ চিরকাল সঙ্গদান করতে পারে। সত্যকার মানুষ প্রতিদিন যাচ্ছে এবং আসছে; তাকে আমরা খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখি, এবং ভুলে যাই, এবং হারাই। অথচ মানুষকে আয়ত্ত করবার জন্যেই আমাদের জীবনের সর্বপ্রধান ব্যাকুলতা। সাহিত্যে সেই চঞ্চল মানুষ আপনাকে বদ্ধ করে রেখে দেয়; তার সঙ্গে আপনার নিগূঢ় যোগ চিরকাল অনুভব করতে পারি। জীবনের অভাব সাহিত্যে পূরণ করে। চিরমনুষ্যের সঙ্গ লাভ করে আমাদের পূর্ণ মনুষ্যত্ব অলক্ষিত ভাবে গঠিত হয়—আমরা সহজে চিন্তা করতে, ভাল-বাসতে এবং কাজ করতে শিখি। সাহিত্যের এই ফলগুলি তেমনি প্রত্যক্ষ-গোচর নয় বলে অনেকে একে শিক্ষার বিষয়ের মধ্যে নিকৃষ্ট আসন দিয়ে থাকেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সাধারণতঃ দেখলে বিজ্ঞান-দর্শন ব্যতীতও কেবল সাহিত্যে একজন মানুষ তৈরি হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-ব্যতিরেকে কেবল বিজ্ঞান-দর্শনে মানুষ গঠিত হতে পারে না।" ['আলোচনা, সাহিত্য']

এই মানবসঙ্গব্যাকুলতাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের মৌল প্রেরণা।

সকল বড় সাহিত্যশিল্পী সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন নি। ওঅর্ডসৃওঅর্থ করেছেন, কোলরিজ করেছেন, শেলী করেছেন, ম্যাথু আর্নল্ড করেছেন, এলিঅট করেছেন; রবীন্দ্রনাথও করেছেন। সাহিত্যজীবনের সূচনা থেকে শেষ পর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা কয়েকটি গ্রন্থে

বিবৃত হয়েছে। 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'পঞ্চভূত', 'শান্তিনিকেতন', 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য' প্রভৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের উদ্দেশ্য, তাৎপর্য, তত্ত্ব ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন ; তথ্য, সত্য, বাস্তব বলতে কি বোঝায় তা আলোচনা করেছেন ; সৌন্দর্য, সত্য ও মঙ্গলের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করেছেন ; সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড বললে কী বোঝায় তা আলোচনা করেছেন।

১৩৩০ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ ফাল্গুন তারিখে সেনেট হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে যে তিনটি ভাষণ দিয়েছিলেন, তার পুনর্লিখিত রূপ 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গবাণী'র ১৩৩১ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত সাহিত্য প্রবন্ধের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আজ আমার বলবার বিষয়টি হচ্ছে সাহিত্য। আর কিছু না হোক, অন্তত পঞ্চাশ বছর ধরে বাল্যকাল থেকেই হাতে-কলমে সাহিত্য নিয়েই আছি। এই সম্বন্ধে অন্য মনীষীদের আলোচিত উপদেশে যদিও কিছু শিক্ষা করতে পারি নি, তবু ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই বিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার আছে। নিরন্তর সাহিত্য প্রবাহ বয়ে বয়ে আমার অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে যে পথ তৈরি হয়েছে সেই পথ দিয়ে আজকার দিনের আলোচনা হয়তো একটা ধারাবাহিক রূপ ধারণ করতেও পারে। আপনা হতেই সেটা হবে এই আশাতেই আজ এখানে এসেছি।" (গ্রন্থপরিচয়—'সাহিত্যের পথে' ৩য় সং)

বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে-অভিমতের সার সংকলন করে সাহিত্যশাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় গড়ে তোলার বিনীত প্রয়াস করা যাক।

॥ ২ ॥

প্রথমেই সাহিত্যের উৎপত্তি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত সংকলন ও যাচাই করা যাক। কবি বলেছেন, "সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে ভাষায়-ভাষায় গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নহে ; মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত

আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে ; তাহারা বিচ্ছিন্ন।

(বাংলা জাতীয় সাহিত্য—'সাহিত্য')

এখানেই কবি ক্ষান্ত হন নি ; আরো বলেছেন, "আমি আছি, আমাকে টিঁকে থাকতে হবে, এই কথাটি যখন সংকীর্ণ সীমায় থাকে তখন আত্মরক্ষা বংশরক্ষা কেবল আমাদের অহংকে আঁকড়ে থাকে। কিন্তু যে পরিমাণে মানুষ বলে যে, অন্যের টিকে থাকার মধ্যেই আমার টিঁকে থাকা সেই পরিমাণে সে নিজের জীবনের মধ্যে অনন্তের পরিচয় দেয়, সেই পরিমাণে 'আমি আছি' এবং 'অন্য সকলে আছে' এই ব্যবধানটি তার ঘুচে যায়। এই অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মাহাত্ম্য ঘটে সেইটেই হচ্ছে আত্মার ঐশ্বর্য, সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে নানা প্রকারে প্রকাশ করতে থাকে। যেখানে একলা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই। টিঁকে থাকার অসীমতা-বোধকে অর্থাৎ 'আপনার থাকা অন্যের থাকার মধ্যে' এই অনুভূতিকে মানুষ নিজেরই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র দৈনিক ব্যবহারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে না। তখন সেই মহাজীবনের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার সেবায় ত্যাগে সে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই মহাজীবনের আনন্দকে আবেগকে সে নানা সাহিত্যে স্থাপত্যে মূর্তিতে চিত্রে গানে প্রকাশ করতে থাকে।" (সাহিত্য—'সাহিত্যের পথে') এখানেই মানুষ পশুজীবনের স্থূলতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত।

সাহিত্যের আনন্দকে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের আনন্দের সঙ্গে এক কর দেখেছেন। এই আনন্দের প্রকাশটাই তাঁর কাছে মুখ্য বলে মনে হয়েছে। সাহিত্য মানুষের আনন্দের প্রকাশ, সেই তার সৃষ্টি, তার অমৃত, তার ঐশ্বর্য, তার সত্য। এখানেই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে, নিজেকে সতরূপে পায়। তাই কবি বলেছেন, "শরীরের পিপাসা ছাড়া আর এক পিপাসাও মানুষের আছে। সংগীত চিত্র সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধে সেই পিপাসা-কেই জানান দিচ্ছে। ভোলাবার জো কী। সে যে অন্তরবাসী একের বেদনা। সে বলেছে, 'আমাকে বাহিরে প্রকাশ করো, রূপে রঙে সুরে বাণীতে নৃত্যে। যে যেমন করে পার আমার অব্যক্ত ব্যথাটিকে ব্যক্ত করে দাও।"

(তথ্য ও সত্য—'সাহিত্যের পথে')

সাহিত্যের উৎপত্তির পিঠ পিঠ আসে সাহিত্যের সামগ্রী। সে প্রশ্নের

আলোচনাও রবীন্দ্রনাথ করেছেন। 'সাহিত্যের পথে'র ভূমিকায় কবি বলেছেন, "যা আনন্দ দেয়, তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।" রবীন্দ্রনাথ 'নীরব কবিত্ব' ও 'আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস'—এই দুটি কথাকে ভ্রান্ত বলে ত্যাগ করেছেন। সাহিত্যের লক্ষ্য মনোভাবের প্রকাশ আর সে প্রকাশ মনে এবং কালে। এইজন্যই সাহিত্যের ললিতকলার উৎপত্তি। "ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।" এই ভাবের সামগ্রী কি? কবির উত্তর, "যে সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের সুর রঙ ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকারে প্রকারে, ভাবে ভাষায়, সুরে ছন্দে মিলিয়া তবেই বাঁচতে পারে; তাহা মানুষের একান্ত আপনার; তাহা আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি। সুতরাং তাহা একবার প্রকাশিত হইয়া উঠিলে তাহার রূপান্তর অবস্থান্তর করা চলে না; তাহার প্রত্যেক অংশের উপরে তাহার সমগ্রতা একান্তভাবে নির্ভর করে। যেখানে তাহার ব্যত্যয় দেখা যায় সেখানে সাহিত্য-অংশে তাহা হেয়।"

(সাহিত্যের সামগ্রী—'সাহিত্য')।

সাহিত্যের উৎপত্তি ও সামগ্রী বিচারের পর যে প্রসঙ্গ স্বভাবতই আসে, তা হল সাহিত্যের তাৎপর্য। এই বিষয়ে কবির সুচিন্তিত অভিমত হল: "সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য অর্থাৎ সম্মিলন। মানুষকে মিলতে হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষকে মিলতে হয় কেবল মেলবারই জন্যে, অর্থাৎ সাহিত্যের উদ্দেশ্যে। শাকসবজির খেতের সঙ্গে মানুষের যোগ ফসল ফলানোর যোগ। ফুলের বাগানের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ পৃথক জাতের। সবজি খেতের শেষ উদ্দেশ্য খেতের বাইরে, সে হচ্ছে ভোজ্যসংগ্রহ। ফুলের বাগানের যে উদ্দেশ্য তাকে এক হিসাবে সাহিত্য বলা যেতে পারে। অর্থাৎ তার সঙ্গে মিলতে চায়—সেখানে গিয়ে বসি, সেখানে বেড়াই, সেখানকার সঙ্গে যোগে মন খুশি হয়। এর থেকে বুঝতে পারি, ভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য কী। তার কাজ হচ্ছে হৃদয়ের যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য।"

(সাহিত্যের তাৎপর্য—সাহিত্যের পথে)

কিন্তু মানুষের চাওয়ার তো অন্ত নেই। সাহিত্যে চাওয়ার ঠাঁই কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেছেন, "মানুষের নানা চাওয়া আছে,

সেই চাওয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে খাবার জন্যে এই মাছকে চাওয়া। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো চাওয়া, বিশ্বের সঙ্গে সাহিত্য অর্থাৎ সম্মিলন চাওয়া—নদীতীরে সেই সূর্যাস্ত আলোকে মহিমান্বিত দিনাবসানকে সমস্ত মনের সঙ্গে মিলিত করতে চাওয়া। বক দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বনের প্রান্তে সরোবরের তটে, সূর্য উঠছে আকাশে, আরক্ত রশ্মির স্পর্শপাতে জল উঠছে ঝলমল করে—এই দৃশ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্মিলিত আপনার মনটিকে ঐ বক কি চাইতে জানে? এই আশ্চর্য চাওয়ার প্রকাশ মানুষের সাহিত্যে। তাই ভর্তৃহরি বলেছেন, যে মানুষ সাহিত্য সংগীতকলাবিহীন সে পশু, কেবল তার পুচ্ছবিষাণ নেই এইমাত্র প্রভেদ। পশুপক্ষীর চৈতন্য প্রধানত আপনার জীবিকার মধ্যেই বদ্ধ। মানুষের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করছে, বিশ্বে প্রসারিত করছে নিজেকে, সাহিত্যে তারই একটি বড়ো পথ।" [তদেব]।

এই বিষয়টিকে কবি আরো বিশ্লেষণ করেছেন এই বলে, "যেদিন থেকে মানুষের হাত পেয়েছে নৈপুণ্য, তার ভাষা পেয়েছে অর্থ, সেইদিন থেকেই মানুষ তার ইন্দ্রিয়-বোধগম্য জগৎ থেকে নানা উপাদানে উদ্ভাবিত করছে তার ভাবসম্য জগৎকে। তার স্বরচিত ব্যাবহারিক জগতে যেমন এখানেও তেমনি; অর্থাৎ তার চারিদিকে যা-তা যেমন-তেমন ভাবে রয়েছে তাকেই সে অগত্যা স্বীকার করে নেয় নি। কল্পনা দিয়ে তাকে এমন রূপ দিয়েছে, হৃদয় দিয়ে তাতে এমন রস দিয়েছে, যাতে সে মানুষের মনের জিনিস হয়ে তাকে দিতে পারে আনন্দ।

ভাবের জগৎ বলতে আমরা কি বুঝি। হৃদয় যাকে উপলব্ধি করে বিশেষ রসের যোগে; অনতিলক্ষ্য বহু অবিশেষের মধ্যে থেকে কল্পনার দৃষ্টিতে যাকে আমরা বিশেষ করে লক্ষ্য করি; সেই উপলব্ধি করা, সেই লক্ষ্য করাটাই যেখানে চরম বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলছি, জ্যোৎস্নারাত্রি। সে রাত্রির বিশেষ একটি রস আছে, মনকে তা অধিকার করে। শুধু রস নয়, রূপ আছে তার, দেখি তা কল্পনার চোখে।......বহু প্রকারের স্পষ্ট ও অস্পষ্টকে এক করে নিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রির একটা স্বরূপ দেখতে পায় আমাদের কল্পনার দৃষ্টি। এই কল্পনাদৃষ্টিতে বিশেষ করে সমগ্র করে দেখার জ্যোৎস্নারাত্রির মানুষের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি জিনিষ। তাকে নিয়ে মানুষের সেই অত্যন্ত কাছে পাওয়ার, মিলে যাওয়ার আনন্দ।" (তদেব)।

এই প্রসঙ্গে অনিবার্যরূপে মনে পড়ে 'চিত্রা' কাব্যের 'পূর্ণিমা' কবিতাটি; সেখানে এই সত্যই আশ্চর্য বাণীমূর্তিতে প্রকাশিত।

সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল ধারণা আমরা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় পাই। এই আলোচনাভূমি থেকেই আমরা পরবর্তী পর্যায়ে যাত্রা করতে পারি। পরবর্তী আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ আরো গভীরে উপনীত হয়েছেন। সাহিত্যের সঙ্গে অনুভূতির সম্পর্কে, বিজ্ঞানের সংযোগ বা বিরোধ, প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক, তথ্য ও বাস্তব বনাম সত্য, রূপ ও রস, রসসাহিত্য, সৌন্দর্য ও মঙ্গল, সৌন্দর্য ও সত্য প্রভৃতি বিষয়ে কবি আলোচনা করেছেন।

॥ ৩ ॥

মানুষ যে পৃথিবীতে জন্মেছিল, সে পৃথিবী তার সম্পূর্ণ মনোমত ছিল না, তাকে সে আপন ইচ্ছামত গড়ে নিয়েছে, এখন মানুষ পৃথিবীকে জয় করতে বেরিয়েছে, তার বিজ্ঞানবুদ্ধিকে ব্যবহার করেছে; প্রকৃতির সহজ অবস্থাকে ছাড়িয়ে স্বতন্ত্র পৃথিবীকে গড়ে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের এই পৃথিবী-অভিযানকে বলেছেন 'আপন ইচ্ছানুগত মানবিক পৃথিবী' রচনা। ব্যবহারিক জগৎ ও অনুভূতির জগৎ—দুইই মানুষকে আকর্ষণ করেছে; মানুষের দুই রূপ—কর্মী ও কবি। "মানুষের বিশ্বজয়ের এই একটা পালা বস্তুজগতে; ভাবের জগতে তার আছে আর একটা পালা। ব্যাবহারিক বিজ্ঞানে একদিকে তার জয়স্তম্ভ, আর একদিকে শিল্প-সাহিত্যে।" [সাহিত্যের তাৎপর্য—সাহিত্যের পথে]। এ দুয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেয়, কোনটিই বা প্রেয়? এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব কি-না?

এই প্রশ্নকে সাহিত্যশাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথ এড়িয়ে যান নি, এর উত্তর অন্বেষণ করেছেন। আজকের জড়বাদী বিজ্ঞান-বুদ্ধিঅহঙ্কৃত পৃথিবীতে এই প্রশ্নকে বাদ দিয়ে সাহিত্য-সাধনা কোনোমতেই সম্ভব নয়, তা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। কবি স্বীকার করেছেন, "আমাদের জানা দু'রকমের, জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা।...প্রয়োজনের দাবি প্রবল এবং তা অসংখ্য। কেননা, যতটা আয়োজন আমাদের জরুরি তা আপন পরিমাণ রক্ষা করে না। অভাব মোচন হয়ে গেলেও তৃপ্তিহীন কামনা হাত পেতে থাকে, সঞ্চয়ের ভিড়

জমে, সন্ধানের বিশ্রাম থাকে না। সংসারের সকল বিভাগেই এই যে 'চাই চাই' এর হাট বসে গেছে এরই আশেপাশে মানুষ একটা ফাঁক খোঁজে যেখানে তার মন বলে 'চাইনে', অর্থাৎ এমন কিছু চাইনে যেটা লাগে সঞ্চয়ে। তাই দেখতে পাই, প্রয়োজনের এত চাপের মধ্যেও মানুষ অপ্রয়োজনের উপাদান এত প্রভূত করে তুলেছে, অপ্রয়োজনের আনন্দ এত প্রভূত করে তুলেছে, অপ্রয়োজনের মূল্য তার কাছে এত বেশি। তার গৌরব সেখানে, ঐশ্বর্য সেখানে, যেখানে সে প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়; তার যে রস সে অহৈতুক।" [সাহিত্যতত্ত্ব—'সাহিত্যের পথে']। এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ অন্যভাবে বলেছেন, "সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়। ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।" [সাহিত্যের সামগ্রী—'সাহিত্যের পথে']।

তাহলে মদমত্ত বিজ্ঞানের প্রবল প্রতাপ ঠেকাব কি দিয়ে? সে প্রশ্নের উত্তরে কবির বক্তব্য: জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পিছনে আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে। ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্যরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত। বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যথার্থে নয়।" ['সাহিত্যের পথে'র ভূমিকা]। পুনশ্চ, "বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তিস্বভাববর্জিত; তার ধর্মই হচ্ছে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখানকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরছে। অথচ সাহিত্যে বিশেষত্বই হচ্ছে তার পক্ষপাত ধর্ম; সাহিত্যের বাণী স্বয়ংবরা। বিজ্ঞানের নির্বিচার কৌতূহল সাহিত্যের সেই বরণ করে নেবার স্বভাবকে পরাস্ত করতে উদ্যত। আজকালকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌনমিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব যে একটা উপদ্রব চলছে সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেস্টোরেশন-যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু সেই যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজটিকা চিরদিনের মতো পায়নি, আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিকতে পারে না।" [সাহিত্যধর্ম—'সাহিত্যের পথে'] বিজ্ঞানের

বেআব্রুনির্বিকার অলজ্জতাকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে রাজী নন, সে সংবাদ এখানে পাওয়া গেল।

অধুনা বিজ্ঞানের 'অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসনমূর্তি ধরে সাহিত্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবি করছে', রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েই কর্তব্য শেষ করেন নি, বিশুদ্ধ সাহিত্যে যে আনন্দের ও রসের আধার তা যে অপ্রয়েজানের, সেকথাও বলেছেন। দ্বিধামুক্ত কবি বলেছেন, "বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়; তার যে রস সে অহৈতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনারকাঠি ছোঁয়া সামগ্রীকে জাগ্রত করে জানে আপনারই সত্তায়। তার সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানি নে।" [সাহিত্যতত্ত্ব—সাহিত্যের পথে]। "সাহিত্যে সেই চিরস্থায়িত্বের চেষ্টাই মানুষের প্রিয় চেষ্টা। সেইজন্য দেশহিতৈষী সমা-লোচকের দল যতই উত্তেজনা করেন যে, সারবান সাহিত্যের অভাব হইতেছে, কেবল নাটক নভেল কাব্যে দেশ ছাইয়া যাইতেছে, তবু লেখকদের হুঁশ হয় না। কারণ সারবান সাহিত্যে উপস্থিত প্রয়োজন মিটে, কিন্তু অপ্রয়ো-জনীয় সাহিত্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বেশি।" [সাহিত্যের সামগ্রী—'সাহিত্য']

আসল কথা এই যে, সাহিত্য কোনো বিশেষ কালের বা রুচির দাসত্ব করবে না, মদমত্ত বিজ্ঞানের অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তির কাছে প্রণত হবে না, বাস্তবের অতিরেকের কাছে মাথা নত করবে না। যেখানে রসের ভোজ, সেখানে জীবনের স্বহস্তের পরিবেশন, কোনো সাম্প্রতিক তথ্য, অহংবুদ্ধি বা রুচিবিকৃতি সেখানে জয়লাভ করতে পারে না। সাহিত্য মানবসংসারের শিল্পরূপ। এর বাইরে আর কোনো প্রাপ্তি বা লোভের প্রত্যাশা সাহিত্যের থাকা উচিত নয় বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। সাহিত্যে আমরা ফিরে ফিরে জীবনকেই পাই এবং তা পাই সত্যরূপে, আনন্দরূপে, অমৃতরূপে। বিজ্ঞান দর্শন রাজনীতি অর্থনীতি মনস্তত্ত্বের বেড়াজাল অধুনা সাহিত্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। তাই আজ নোতুন করে স্মরণ করি সাহিত্য-শাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয়দৃঢ় গভীর কণ্ঠস্বর—"জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে অদৃশ্য, তবুও বহু শত আছে যা প্রত্যক্ষ, ইতিহাসে যা উজ্জ্বল। জীবনের এই সৃষ্টিকার্য যদি সাহিত্যে

যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে। সেইরকম সাহিত্যই ধন্য—ধন্য ডন কুইকসট, ধন্য রবিনসন ক্রুশো। আমাদের ঘরে ঘরে রয়ে গেছে, আঁকা পড়ছে জীবনশিল্পীর রূপ-রচনা। কোনো কোনটা ঝাপসা, অসম্পূর্ণ এবং অসমাপ্ত আবার কোনো-কোনটা উজ্জ্বল। সাহিত্যে যেখানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষকালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে ওঠে সেখানেই সাহিত্যের অমরাবতী।" [সাহিত্যের মূল্য—'সাহিত্যের স্বরূপ']।

॥ ৪ ॥

এরপর তথ্য ও সত্য, বাস্তব ও সত্য, সুন্দর ও সত্য সম্পর্কিত অভিমত সংকলন ও বিচার করা যাক।

রবীন্দ্রনাথ তথ্য ও সত্যের সীমানা সন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন, আমাদের "মন যে জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করে সেটা দুইমুখো পদার্থ, তার একটা দিক হচ্ছে তথ্য, আর একটা দিক হচ্ছে সত্য। যেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্ছে তথ্য। সেই তথ্য যাকে অবলম্বন করে থাকে সেই হচ্ছে সত্য।...তথ্য খণ্ডিত, স্বতন্ত্র—সত্যের মধ্যে সে আপন বৃহৎ ঐক্যকে প্রকাশ করে। আমি ব্যক্তিগত আমি এই তথ্যটুকুর মধ্যে, আমি মানুষ এই সত্যটিকে যখন আমি প্রকাশ করি তখনই বিরাট একের আলোকে আমি নিত্যতায় উদ্ভাসিত হই। তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ। যেহেতু সাহিত্য ও ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এইজন্যে তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। এই স্বাদটি হচ্ছে একের স্বাদ, অসীমের স্বাদ।" [তথ্য ও সত্য—'সাহিত্যের পথে]।

বিদ্যাপতির একটি পদ উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবি বলেছেন, গোধূলি বেলায় মন্দির থেকে একটি বালিকা বার হয়ে এল। এ কেবল তথ্য, অতি সামান্য সাধারণ তথ্য। দৈনন্দিতার তুচ্ছতাকে তা উত্তীর্ণ হতে পারে নি। কিন্তু যে মুহূর্তে ছন্দে স্বরে উপমার যোগে এই সামান্য তথ্য 'একটি সুষমার অখণ্ড ঐক্যে সম্পূর্ণ' হয়ে দেখা দিল, তখনি তা আর সামান্য রইল না, অসামান্যতা লাভ করল। সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত

হল। তথ্যের সংকীর্ণ শাসন অগ্রাহ্য করে তা সত্যের উদার ক্ষেত্রে রসের অমরাবতীতে প্রতিষ্ঠিত হল। বিদ্যাপতি বললেন—

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

এখানে "তথ্যের বাহুল্য বাদ পড়েছে বলেই সংগীত্যের বাঁধনের ছোটো কথাটি এমন একত্বে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কবিতাটি এমন সম্পূর্ণ অখণ্ড হয়ে জেগেছে, পাঠকের মন এই সামান্য তথ্যের ভিতরকার সত্যকে এমন গভীর ভাবে অনুভব করতে পেরেছে। এই সত্যের ঐক্যকে অনুভব করবামাত্র আমরা আনন্দ পাই।" (তদেব)।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, "সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়।...রূপের মহলে রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে তথ্যের দাসখত থেকে মুক্তি নিতে হয়।" (তদেব)।

বিদ্যাপতির আর একটি পদ উদ্ধার করে পরিহাস করেছেন, বলেছেন সাহিত্যের সত্য বিজ্ঞানের তথ্য ও অংকশাস্ত্রের সত্যে ধরা পড়ে না, রসের জগতে বিষয়বুদ্ধি অচল, তাই রসিকের একথাই সত্য যে—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন ন তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

"নিত্যলোকে রসলোকে তথ্যবন্ধন থেকে মানুষের এই যে মুক্তি। একি কম মুক্তি।" (সৃষ্টি—'সাহিত্যের পথে') সাহিত্য ও ললিতকলায় এই মুক্তির স্বর্গ অবারিত।

এর পর রবীন্দ্রনাথ যে প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ— বাস্তব—এর সংজ্ঞা ও ব্যাপকতা স্বরূপ ও ভূমিকা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। 'সাহিত্যের পথে'র ভূমিকায় কবি এই সমস্যার কথা চিন্তা করেছেন, বলেছেন, "ইংরেজীতে যাকে বলে রীয়ল, সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য।" এ বিষয়ে তাঁর বিস্তৃত অভিমত এই—"ইংরাজীতে যাকে real বলে, বাংলায় তাকে বলি যথার্থ, অথবা সার্থক। সাধারণ সত্য হল এক, আর সার্থক সত্য হল আর। সাধারণ সত্যে একেবারে বাছবিচার নেই, সার্থক

সত্য আমাদের বাছাই করা। মানুষমাত্রেই সাধারণ সত্যের কোঠায়, কিন্তু যথার্থ মানুষ 'লাখে না মিলয় এক'।...কবির চিত্তে, রূপকারের চিত্তে এই যথার্থ-বোধের সীমানা বৃহৎ বলে সত্যের সার্থকরূপ তিনি অনেক ব্যাপক করে দেখাতে পারেন। যে জিনিষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি সেই জিনিষই সার্থক। একটুকরো কাঁকর আমার কাছে কিছুই নয়, একটি পথ আমার কাছে সুনিশ্চিত। অথচ কাঁকর পদে পদে ঠেলে ঠেলে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়, চোখে পড়লে তাকে ভোলবার জন্যে বৈদ্য ডাকতে হয়, ভাতে পড়লে দাঁতগুলো আঁৎকে ওঠে; তবু তার সত্যের পূর্ণতা আমার কাছে নেই। পদ্ম কনুই দিয়ে বা কটাক্ষ দিয়ে ঠেলাঠেলির উপদ্রব একটুও করে না; তবু আমার সমস্ত মন তাকে আপনি এগিয়ে গিয়ে স্বীকার করে।" [সাহিত্য-ধর্ম—'সাহিত্যের পথে'] 'Personality' গ্রন্থে কবি এ-কথাই বলেছেন, 'And this in Reality which is truth made our own,—truth that has eternal relation with the Supreme Person'. তাই পথ রীয়ল বা সার্থক সত্য বা যথার্থ, আর কাঁকর হল সাধারণ সত্য।

যা দৈনন্দিন প্রয়োজনের দ্বারা চিহ্নিত, তা সাধারণ সত্য সাহিত্যের আসরে তার ঠাঁই নেই বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। যেমন, বকফুল, বেগুনের ফুল, কুমড়ো ফুল বা সজনে ফুল। যা আমাদের ভোগের দ্বারা খর্ব হয় না, তাই সার্থক বা রীয়ল। যেমন—কুন্দ, টগর, শিরীষফুল। এই কারণেই রুই সাহিত্যে বর্জনীয়, মকর গ্রাহ্য।

এখানেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নবীন লেখকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতভেদ। বাস্তব বললে কেবল যথার্থ সত্যকে বোঝাবে, আর সাধারণ সত্যকে বোঝাবে না—একথা আধুনিক পশ্চিমী বা বাংলা সাহিত্য স্বীকার করে না। রবীন্দ্রনাথ সেইজন্য আধুনিক পশ্চিমী কবিতাকে কখনো অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেন নি। কল্লোল-কালকলম-গোষ্ঠীর সাহিত্যকে লক্ষ্য করে তিনি তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছেন, "সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বেআব্রুতা এসেছে সেটাকে এখনকার কেউ কেউ মনে করেছেন নিত্যপদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রেসি তাল

ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।" (তদেব)। রবীন্দ্রনাথ একে কোনদিন ক্ষমা করেন নি।

তা হলে রবীন্দ্রনাথ কোন বাস্তবকে স্বীকার করেন? কবি বলেছেন, "যে সত্য আমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগার অপেক্ষা করে না। অস্তিত্ব ছাড়া যার অন্য কোনো মূল্য নেই, সে হল বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু যা-কিছু আমাদের সুখদুঃখবেদনার স্বাক্ষরে চিহ্নিত, যা আমাদের কল্পনার দৃষ্টিতে সুপ্রত্যক্ষ, আমাদের কাছে তাই বাস্তব। কোন্‌টা আমাদের অনুভূতিকে প্রবল করে নাড়া দেবে আমাদের কাছে দেখা দেবে নিশ্চিত রূপ ধরে, সেটা নির্ভর করে আমাদের শিক্ষাদীক্ষায়, আমাদের স্বভাবের আমাদের অবস্থার বিশেষত্বের উপরে। আমরা যাকে বাস্তব বলে গ্রহণ করি, সেইটেতেই আমাদের যথার্থ পরিচয়। এই বাস্তবের জগৎ কারো প্রশস্ত, কারো সংকীর্ণ। কারো দৃষ্টিতে এমন একটি সচেতন সজীবতা আছে বিশ্বের ছোটবড় অনেক কিছুই তার অন্তরে সহজে প্রকাশ করে। বিধাতা তার চোখে লাগিয়ে রেখেছেন বেদনার স্বাভাবিক দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণ শক্তি।" ['বাংলা ভাষা পরিচয়']।

প্রথম বিশ্বসমরোত্তর ইংরেজি কবিতায় যে বাস্তবতার পরিচয় পাই, তা রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ করেছে। 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে ['সাহিত্যের পথে'] কবিমনের বিরুদ্ধতার পরিচয় আছে। এলিয়টের "Aunt Helen" কবিতার সারমর্ম—যেখানে বড়োঘরের মহিলার মৃত্যুবর্ণনা আছে—তা উদ্ধার করে পরবর্তী ন্যক্কারজনক ঘটনাকে ধিক্কার দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। কিন্তু সেকেলে মেজাজের লোকের মনে প্রশ্ন উঠবে তাহলেই কি যথেষ্ট হল। এ কবিতাটা লেখবার গরজ কী নিয়ে, এটা পড়তেই বা যাব কেন।......মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগ বাস্তবকে সম্মান করে তাকে শ্রদ্ধেয়রূপেই অনুভব করতে চেয়েছিল; এ যুগ বাস্তবকে অবমানিত করে সমস্ত আব্রু ঘুচিয়ে দেওয়াকেই সাধনার বিষয় বলে মনে করে।" (তদেব)। তাই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যরুচির অলজ্জ কৌতূহল এবং নির্বিচার বর্ণনাকে 'চিত্তের আবিলতা' বলেছেন এবং আধুনিকপন্থীদের 'অঘোরপন্থী' বলে ভৎর্সনা করেছেন। এ বিষয়ে কবির অভিমত সংহত হয়েছে একটি বাক্যে—"সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রস পাই, অন্তরের মধ্যে যখন পাই তার নিবিড় উপলব্ধি, জ্ঞানে নয় স্বীকৃতিতে, তাকেই বলি বাস্তব।" ('সাহিত্যের স্বরূপ' : নাম-প্রবন্ধ)।

॥ ৫ ॥

এবার রূপ ও রস, রস ও সত্য, সত্য ও সৌন্দর্য, রসসাহিত্য, সৌন্দর্য মঙ্গল ও সত্যসম্পর্কিত অভিমতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। সাহিত্যের বিষয়বস্তু কী হবে, এ বিষয়ে বহু আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন রূপের উপরে। "রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম"—এ'কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন।

রূপসৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে থাকেন, একথা মনে রেখেই বর্তমান প্রসঙ্গে অবতরণ করা যাক।

সাহিত্যে আমরা কাকে খুঁজি? অবশ্যই রসকে। তাহা 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী'। "রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করতে পারে না।...রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে রসটি উপভোগ করিয়াছে আজও তাহা বাতিল হয় নাই। কিন্তু বস্তুর দর বাজার অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হইতে থাকে।" [বাস্তব—'সাহিত্যের পথে']। এইজন্যে রবীন্দ্রনাথ ওঅর্ডসওঅর্থ, শেলী, কীটসের কবিতায় রস পেয়েছেন, সাম্রাজ্যের ঢক্কানিনাদী কিপলিং ও টেনিসনের কবিতায় পান নি। কবিদের অবলম্বন এই রস। কবির পাথেয় —'অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ'। "কবি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন, যদি শিক্ষা অভ্যাস প্রথা শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবল মাত্র দশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন, তবে তিনি নিখিলের সংস্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনো সন্দেহ থাকিবে না। বিশ্ববস্তু ও বিশ্বরসকে একেবারে অব্যবহিতভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন এইখানেই তাঁহার জোর।...তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তাহারই পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই।...তাহা আনন্দময়, তাহা অনির্বচনীয়।" (তদেব)। এখানে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র ব্যাখাত 'স্বসংবিদানন্দ চর্বণ ব্যাপার'কে 'আত্মচেতনার

অনুভূতি' বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। কবি বিশ্বাস করেন, যে অনুভূতির অভিজ্ঞতা কাব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে সে অনুভূতি অলৌকিকতার রসে সিঞ্চিত হয়ে ওঠে; লৌকিক ভাব রূপের গুণে অলৌকিক রসে পরিণত হয়।

বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ তিন ভাবে স্থাপিত হতে পারে—প্রয়োজনের সম্বন্ধ, ওজনের সম্বন্ধ, রসের সম্বন্ধ। "এই যে প্রয়োজনের অতীত জ্ঞানের অতীত মানুষের চিত্তচেষ্টা—একে বলব মানুষের ইচ্ছার প্রেরণা। বিশ্বকে ব্যবহার করি, বিশ্বকে জানি, আবার বিশ্বকে আমরা ইচ্ছা করি—অর্থাৎ, তার রস ভোগ করতে চাই। যে উপলব্ধিতে রস পাই সেই উপলব্ধিটি অব্যবহিত। সত্তার এই উপলব্ধি সংবাদমাত্র নয়—এটা অনুভূতি, স্বতঃপ্রতীত। ফুল আমার ভালো লাগল এজন্য ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই, বিচার বিবেচনা অনাবশ্যক। বস্তুত এই ফুলকে অনুভব করা নিজেকেই একটা বিশেষভাবে অনুভব করা। নিজেরই সত্তাকে একটা বিশেষ রসে রসিয়ে দেখি—গোলাপ আমারই আত্মবোধকে আনন্দদ্বারা নিবিড় করে তোলে, তাতে আমারই সত্তার বিকাশ।" [রূপকার—'সাহিত্যের পথে']। কবিতায় একথাই কবি বলেছেন—

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর—
সুন্দর হল সে।

[আমি, শ্যামলী]

এবার প্রশ্ন, এই 'আত্মচেতনার অনুভূতি' বা 'অলৌকিক রস' কীভাবে প্রকাশিত হবে? রবীন্দ্রনাথ সে প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন—"কলাসৃষ্টিতে রসসত্যকে প্রকাশ করবার সমস্যা হচ্ছে—রূপের দ্বারাই অরূপকে প্রকাশ করা, অরূপের দ্বারা রূপকে আচ্ছন্ন করে দেখা, ঈশোপনিষদের সেই বাণীটিকে গ্রহণ করা, পূর্ণের দ্বারা সমস্ত চঞ্চলকে আবৃত করে দেখা এবং মা গৃধঃ—লোভ কোরো না

—এই অনুশাসন গ্রহণ করো। সৃষ্টির তত্ত্বই এই; জগৎসৃষ্টিই বল, আর কলাসৃষ্টিই বল। রূপকে মানতেও হবে, নাও মানতে হবে, তাকে ধরতেও হবে, তাকে ঢাকতেও হবে। রূপের প্রতি লোভ না থাকে যেন।" [সৃষ্টি—'সাহিত্যের পথে']। কলাসৃষ্টিতে কসরৎ ও বাহ্য অসংযমকে কবি এখানে নিন্দা করেছেন।

প্রসঙ্গত কবি ট্রাজেডির রস নিয়ে আলোচনা করেছেন; বলেছেন—"রসমাত্রেই, অর্থাৎ সকলরকম হৃদয় বোধেই, আমরা বিশেষভাবে আপনাকেই জানি, সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ।...দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে। দুঃখের কটু স্বাদে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর। ট্রাজেডির মূল্য এই নিয়ে। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামচন্দ্রের নির্বাসন, মন্থরার উল্লাস, দশরথের মৃত্যু এর মধ্যে ভালো কিছুই নেই। সহজ ভাষায় যাকে আমরা সুন্দর বলি, এ ঘটনা তার সমশ্রেণীর নয়, একথা মানতেই হবে। তবু এই ঘটনাটা নিয়ে কত কাব্য নাটক ছবি গান পাঁচালি বহুকাল থেকে চলে আসছে, ভিড় জমেছে কত, আনন্দ পাচ্ছে সবাই। এতেই আছে বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিপুরুষের প্রবল আত্মানুভূতি। বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।" "সাহিত্যতত্ত্ব—'সাহিত্যের পথে']। কবির 'আগমন' কবিতায় ('খেয়া') এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যশাস্ত্রী এই কথাই বলেছেন—'Tragedy satisfies us even in the moment of distressing us'; পুনশ্চ, 'In a tragedy we identify ourselves with the hero'. ট্রাজেডির আনন্দ আত্মানুভূতির আনন্দ। তাই তা কাম্য। "দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক।...গভীর দুঃখ ভূমা, ট্রাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখম্।" [সাহিত্যের পথে'র ভূমিকা]।

এইবার রস, রসসাহিত্য ও সুন্দরের কথা। এই প্রসঙ্গের আলোচনায় দেখি রবীন্দ্রনাথ এক মতে আবদ্ধ থাকেন নি, বারংবার মত ও সিদ্ধান্ত

পরিবর্তন করেছেন। তিনি একবার বলেছেন, "যে প্রকাশচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন প্রয়োজনের রূপকে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা, সেই চেষ্টারই সাহিত্যগত ফলকে আমি রসসাহিত্য নাম দিয়েছি।" [তথ্য ও সত্য—সাহিত্যের পথে']। আবার বলেছেন, "সুন্দরকে প্রকাশ করাই রসসাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নয়, সে কথা পূর্বেই বলেছি। সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতায় একটা স্তর আছে, সেখানে সৌন্দর্য খুবই সহজ। ফুল সুন্দর, প্রজাপতি সুন্দর, ময়ূর সুন্দর। এ সৌন্দর্য একতলাওয়ালা, এর মধ্যে সদর-অন্দরের রহস্য নেই, এক নিমেষেই ধরা দেয়, সাধনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই প্রাণের কোঠায় যখন মনের দান মেশে চরিত্রের সংস্রব ঘটে, তখন এর মহল বেড়ে যায়, তখন সৌন্দর্যের বিচার সহজ হয় না। যেমন মানুষের মুখ।" (সাহিত্যতত্ত্ব—'সাহিত্যের পথে')। তখন মত পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল। যাকে সুন্দর বলি তার কোঠা সংকীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বহুদূরপ্রসারিত। মন ভোলাবার জন্য তাকে অসামান্য হতে হয় না, সামান্য হয়েও তা বিশিষ্ট।" (তদেব)। যা সামান্য, যা প্রত্যক্ষগোচর, যা নিকটের, তাও সাহিত্যের অমরাবতীতে ঠাঁই পেতে পারে, একথা স্বীকার করে কবি বলছেন—"হয়তো কোনো মানবচরিত্রজ্ঞ বলেন, শকুনির মতো এমন অবিমিশ্র দুর্বৃত্তরা স্বাভাবিক নয়, ইয়াগোর অহেতুক বিদ্বেষবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহদগুণ থাকা উচিত ছিল; বলেন, যেহেতু কৈকেয়ী বা লেডি ম্যাকবেথ, হিড়িম্বা বা শূর্পনখা নারী, 'মায়ের জাত', এইজন্যে এদের চরিত্রে ঈর্ষা বা তদাশয়তার অত নিবিড় কালিমা আরোপ করা অশ্রদ্ধেয়। সাহিত্যের তরফে বলবার কথা এই যে এখানে আর কোনো তর্কই গ্রাহ্য নয়, কেবল এই জবাবটা পেলেই হল' যে চরিত্রের অবতারণা হয়েছে তা সৃষ্টির কোঠায় উঠেছে, তা প্রত্যক্ষ।" (তদেব)। সুন্দরের জায়গায় এল 'মনোহর' এল 'স্বভাবজাত সৃষ্টি', এল প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আনন্দ'। "যেকোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব।" এখানে কেবল বিশুদ্ধ আনন্দরূপ নয়, প্রয়োজনের রূপও এসেছে—তবে তা সৃষ্টির কোঠায় উঠেছে। প্রশ্ন এই যে প্রয়োজনের রূপ সৃষ্টির কোঠায় উঠলেই কি তার প্রত্যক্ষ বাস্তব খোলসটা খসে পড়ে ও সে বিশুদ্ধ আনন্দরূপে পরিণত হয়? তার প্রয়োজন নেই, একথাও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, আবার বিশুদ্ধ আনন্দরূপকেও চাইছেন। বোধ করি শেলীর 'A Defence of Poetry'তে

এর স্পষ্ট সমাধান পাওয়া যাবে—"Poetry turns all things to loveliness ; it exalts the beauty if that which is most beautiful, and it adds beauty to that which is most deformed."

রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই চিন্তাসংকট সম্পর্কে সচেতন, তার প্রমাণ 'সাহিত্যের পথের ভূমিকা। সেখানে কবি বলছেন, "একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেম, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাড়ুদত্তকে সুন্দর বলা যায় না—সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না। তখন মনে এল, এতদিন যা উল্টো করে বলছিলুম তাই সোজা করে বলার দরকার। বললুম, সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুতঃ বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্যে কী দিয়ে এই সৌন্দর্যের বোধকে জাগায় সে কথা গৌণ, নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের। তাকে সুন্দর বলি বা না বলি তাতে কিছু আসে যায় না। বিশ্বের অনেক উপেক্ষিতের মধ্যে মন তাকেই অঙ্গীকার করে নেয়।" এখানে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যোপলব্ধির আন্তরিকতা ও গভীরতা প্রকাশিত হয়েছে।

॥ ৬ ॥

এবার সৌন্দর্য, মঙ্গল ও সত্যের আলোচনা। উপনিষদের শিক্ষায় যিনি আপন জীবনকে গঠন করেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথের কাছে এই তিন একই বৃন্তে বিধৃত। তাই তিনি বলেছেন, জগতে সৌন্দর্য বলিয়া এই যে আমাদের একটা উপরি-পাওনা ইহা আমাদের মনকে কোনদিকে চালাইতেছে? ক্ষুধা-তৃপ্তির ঝোঁকটাই যাহাতে একেশ্বর হইয়া না উঠে, যাহাতে আমাদের মন হইতে তাহার ফাঁস একটু আলগা হয়, সৌন্দর্যের সেই চেষ্টা দেখিতে পাই ......সৌন্দর্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়াছে। জগতের সঙ্গে আমাদের কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রাখিয়া আনন্দের সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। প্রয়োজনের সম্বন্ধে আমাদের দৈন্য, আমাদের দাসত্ব; আনন্দের সম্বন্ধেই আমাদের মুক্তি। তবেই দেখা যাইতেছে, পরিণামে সৌন্দর্য মানুষকে সংযমের দিকেই টানিতেছে। ......সৌন্দর্য যেমন আমাদিগকে ক্রমে

ক্রমে শোভনতার দিকে, সংযমের দিকে, আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে, সংযমও তেমনি আমাদের সৌন্দর্যভোগের গভীরতা বাড়াইয়া দিতেছে। ......সৌন্দর্য-বোধের যথার্থ পরিণামভাব কখনোই প্রবৃত্তির বিক্ষোভ চিত্তের অসংযমের সঙ্গে এক ক্ষেত্রে টিঁকিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। যথার্থ যে মঙ্গল তাহা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে এবং তাহা সুন্দর; অর্থাৎ প্রয়োজনসাধনের ঊর্ধ্বেও তাহার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে। নীতি পণ্ডিতেরা জগতের প্রয়োজনের দিক হইতে নীতি-উপদেশ দিয়া মঙ্গলপ্রচার করিতে চেষ্টা করেন এবং কবিরা মঙ্গলকে তাহার অনির্বচনীয় সৌন্দর্যমূর্তিতে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমাদের সৌন্দর্যবোধেও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের সুখকর ও অসুখকর, জীবনের মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর, এই দুয়ের ঘর্ষণের দ্বন্দ্বে স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ করিতে করিতে একদিন যদি পূর্ণভাবে জলিয়া উঠে তবে তাহার সমস্ত আংশিকতা ও আলোড়ন নিরস্ত হয়। তখন কী হয়? তখন দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়া সমস্তই সুন্দর হয়, তখন সত্য ও সুন্দর একই কথা হয়ে উঠে। তখনই বুঝিতে পারি, সত্যের যথার্থ উপলব্ধি মাত্রই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য।......মানবের সমস্ত সাহিত্য সংগীত ললিতকলা জানিয়া এবং না জানিয়া এই দিকেই [সত্যের অনুভূতি ও সৌন্দর্যের অনুভূতির মিলনতীর্থে] চলিতেছে। মানুষ তাহার কাব্যে চিত্রে শিল্পে সত্যমাত্রকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে। আধুনিক কবি বলিয়াছেন: Truth is beauty, beauty truth। আমাদের শুভ্রবসনা কমলা দেবী সরস্বতী একাধারে truth এবং beauty মূর্তিমতী। উপনিষদও বলিতেছেন: আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দ-রূপ তাহাই তাঁহার অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্তই truth এবং beauty, সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্। সত্যের এই আনন্দরূপ অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্যসাহিত্যের লক্ষ্য।" [সৌন্দর্যবোধ—'সাহিত্য']। এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি সপ্রকাশ, ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিজ্ঞান কৌতূহল ও অলব্ধ বিশ্লেষণ কেন সাহিত্যে স্বীকার করতে চান না, সে প্রশ্নের উত্তর এখানেই রয়েছে।

সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা এইখানেই শেষ, এরপর রয়েছে সাহিত্যের বিচার।

॥ ৭ ॥

সাহিত্যের বিচার কী ভাবে হওয়া উচিত—এই প্রশ্নের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ গভীর রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যে ভালো লাগা মন্দ লাগা হল শেষ কথা': রবীন্দ্রনাথ এ সত্য স্বীকার করেন। তথাপি সাহিত্যের বিচারকে বর্জন করা যায় না। তাই কবির বক্তব্য: "সাহিত্য বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিস দেখিতে হয়। প্রথম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি,—দ্বিতীয়, তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা। সকল সময় এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। যেখানে থাকে সেখানেই সোনায় সোহাগা।" [সাহিত্যের তাৎপর্য—'সাহিত্য']।

আমাদের দেশে সাহিত্যবিচারের নামে অ-সাহিত্যিক বিচারকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে বলে কবি দুঃখবোধ করেছেন—"বাংলাদেশেই এমন মন্তব্য শুনতে হয়েছে যে, দাশুরায়ের পাঁচালি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তা বিশুদ্ধ স্বাদেশিক। এটা অন্ধ অভিমানের কথা।" [সাহিত্যবিচার—'সাহিত্যের পথে']। আরো বলেছেন, "সাহিত্যবিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণসংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।" (তদেব)। এই প্রসঙ্গে য়ুরোপীয়জ্ঞানে রাজসিকতার প্রতি অবজ্ঞা, বিশুদ্ধ স্বাদেশিকতার সংকীর্ণ আত্মাভিমান, নারীত্বের স্বতন্ত্র অভিমান, য়ুরোপীয় প্রভাবের প্রতি বিমুখতার কবি তীব্র নিন্দা করেছেন। কবি আরো বলেছেন, "আমরা সহজেই ভুলি যে, জাতিনির্ণয় বিজ্ঞানে, জাতির বিবরণ ইতিহাসে, কিন্তু সাহিত্যে জাতিবিচার নেই, সেখানে আর সমস্তই ভুলে ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে হবে।...সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্যবিচারের ব্যক্তি নিয়ে, তার জাতি-কূল নিয়ে নয়। অবশ্য, সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিম্বা তাত্ত্বিক বিচার হতে পারে। সেরকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।" (তদেব)।

সাহিত্যবিচারের আরেকটি প্রাসঙ্গিক দিক হল, সাহিত্যে দলবদ্ধতার ও দলানুগত্যের প্রশ্ন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত পাই 'সাহিত্যের পথে'

গ্রন্থে। বর্তমানকাল ভীড়ের কাল, সবকিছুই লোকচক্ষুর গোচরে, আপন মনে কাজ করার অবকাশ আর নেই। ভীড়ের সঙ্গে এসেছে সাহিত্যের সম্মেলন। 'পঞ্চাশোর্ধ্বম্', 'সাহিত্য সম্মিলন', 'সাহিত্যসমালোচনা', 'সাহিত্যরূপ', 'বাঙলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। কবি বলেছেন, "দল বেঁধে সাহিত্য হয় না। সাহিত্য হচ্ছে একমাত্র সৃষ্টি যা মানুষ একলাই করেছে। যখন সেটা দল বাঁধার কোঠায় গিয়ে পড়ে তখন সেটা আর সাহিত্য থাকে না।" ('সাহিত্য-সমালোচনা')। পুনশ্চ, "সাহিত্যের মতো দলছাড়া জিনিস আর কিছু নেই। বিশেষ একটা চাপরাশ-পরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতেই সেটা অবিশ্বাস করা উচিত। কোনো একটা চাপরাশের জোরে যে সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার গৌরব খুব চড়া গলায় প্রমাণ করতে দাঁড়ায় জানব তার গোড়ায় একটা দুর্বলতা আছে। তার ভিতরকার দৈন্য আছে বলেই চাপরাশের দেমাক বেশী হয়।" ('সাহিত্যরূপ')। পুনরপি, "সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত; শ্রেণীগত নয়। এখানে 'ব্যক্তি' শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপরেই জোর দিতে চাই। স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র।' ('সাহিত্যবিচার')। আরো স্পষ্ট করে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটি প্রকাশ করেছেন—"সাহিত্য ব্যাপারে সম্মিলনীর কোন প্রকৃত অর্থ নেই। পৃথিবীতে দশে মিলে অনেক কাজ হয়ে থাকে, কিন্তু সাহিত্য তার অন্তর্গত নয়। সাহিত্য একান্তই একলা মানুষের সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্য যদি দল-বাঁধা মানুষের সৃষ্টি হতো তাহলে আজ তার কী দুর্গতি তা মনে করলেও বুক কেঁপে ওঠে।...এই একটি জিনিস ঈর্ষাপরায়ণ বাঙালি সৃষ্টি করতে পেরেছে কারণ সেটা বহুজনে মিলে করতে হয়নি।" ('বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ')। এখানেই কবি ক্ষান্ত হন নি, আধুনিক লেখকদের উদ্দেশ্যে কবির আহ্বান: "আমি কামনা করি তাঁরা যুগ প্রবর্তনের লোভে পড়ে তাঁদের লেখার সর্বাঙ্গে কোনো দলের ছাপের উলকি পরিয়ে তাকে সজ্জিত করা হল বলে না মনে করেন।" (সাহিত্যসমালোচনা)। সাহিত্য নিত্য-কেই বরণ করে, নব্য হুজুগ—হোক সে রাজনৈতিক বা সামাজিক—রসের আধার হতে পারে না বলে কবি মনে করেন, তাই বলেছেন, "যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না।" (সাহিত্যধর্ম)।

আজকের নব্য প্রগতি সাহিত্য অতীতের মঙ্গল, সত্য ও সুন্দরের

দায়কে অস্বীকার করে, তাই তা নিত্য নয় বলেই তার মহতী বিনষ্টি ঘটবে। নিত্যতা ও নব্যতা এক নয়। বাঙলা সাহিত্যে উত্তেজনা ও মাৎলামিকে পৌরুষ বলে মনে করা হয়েছিল 'তিরিশের' যুগে, তা সবারই জানা। রবীন্দ্রনাথ এতে শংকিত হয়েছেন, বলেছেন, "ভাবনার বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের শাস্ত্রমানা ধাত। এইরকম মানুষেরা যখন আচার মানে তখন যেমন গুরুর মুখের দিকে চেয়ে মানে যখন আবার ভাঙে তখনও গুরুর মুখের দিকে চেয়েই ভাঙে। রাশিয়া বা আর কোনো পশ্চিম দিগন্তে যদি গুরু নবীন বেশে দেখা দেন, লালটুপি পরে বা যে কোনো উগ্র সাজেও হোক, তবে আমাদের দেশের ইস্কুল মাষ্টাররা অভিভূত হয়ে পড়েন।" [সাহিত্যে নবত্ব—সাহিত্যের পথে]। ফলে শক্তিহীনের কৃত্রিমতা ও মাৎলামি সাহিত্যকে আবিল করে তোলে। "আধুনিক সাহিত্যে সেই রকম [বিলিতি পাঠশালার মতো] শিশিতে সাজানো বাঁধা বুলি আছে—অপটু লেখকের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারি পাউডর'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্রের আস্ফালন, আর একটা লালসার অসংযম।" (তদেব)। কল্লোল কালিকলম প্রগতি গোষ্ঠির তিরিশেরদশকের সাহিত্যকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ এই তীব্র ভর্ৎসনাবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন এবং সেদিন এর প্রয়োজন ছিল বিশেষ রকমের। এর থেকে মুক্তির পথ তিনিই দেখিয়েছেন, 'পুনশ্চ' কাব্যে তাঁর প্রথম সূচনা!

শেষ প্রসঙ্গ : সাহিত্যে আধুনিকতা। রবীন্দ্রনাথ উনিশ ও বিশ শতকের ইংরেজি কাব্যের আলোচনা করে এর স্বরূপ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। কবি বলেছেন, "কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এইজন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলংকারের উপর নয়। কেন না অলংকারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্য। আজকের দিনে যে সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেছে, সে সাবেককালের কৌলিন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই।" (আধুনিক কাব্য—'সাহিত্যের পথে')। আধুনিক ইংরেজি কবিতার কিছু কিছু উদাহরণ কবি দিয়েছেন 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে। Orick Johns, Amy Lowell Edurn Robinson, Ezra Pound, Eliot-এর কবিতা উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন আধুনিক পশ্চিমী কবিতা চিত্ত বিকারজাত।

'আধুনিকতা' বাস্তবপক্ষে "কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা। ...এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।" এই মর্জি যেখানে সেখানে তা প্রাচীন হলেও আধুনিক, যেমন—হাজার বছরের প্রাচীন চীনে কবি লি-পো'র কবিতা; আর যেখানে এই মর্জি বা নিরাসক্ত মন নেই, সেখানে তা একালের হলেও আধুনিক নয়, যেমন এলিঅটের "Aunt Hellen" কবিতা—যেখানে একদিকে বড়োঘরের মহিলা মারা গেল, অপর-দিকে খাবার ঘরে বাড়ির বড়ো খানসামা মেজো ঝিকে কোলের উপর টেনে নিল।" চীনে কবিতাটির পাশে বিলিতি কবিদের আধুনিকতা সহজ ঠেকে না। সে আবিল।" তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন।

তাহলে বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী? কবির উত্তর: "বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদগতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান নিরাসক্তচিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্তচিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।" (তদেব)। পুনশ্চ, "সায়ান্সেই বল আর্টেই বল নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন; য়ুরোপ সায়ান্সে সেটা পেয়েছে, কিন্তু সাহিত্যে পায় নি। (তদেব)।

এইভাবে বিচার করে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে ধ্রুব আদর্শ ও সত্য পথের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ রূপসৃষ্টিকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে-ছেন, নিত্যলোকে রসের জগতে তথ্যবন্ধন থেকে মানুষের যে মুক্তি ঘটে তাকেই অভ্যর্থনা করেছেন, অন্তরের অনুভূতি ও আত্মপ্রসাদকে বড় করে তুলে ধরেছেন। সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ কখনো সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করে রাখতে চান নি। বলেছেন, "বস্তুত বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষা রচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।" (সাহিত্যের তাৎপর্য—'সাহিত্য')।

মানবসঙ্গব্যাকুলতাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের মৌল প্রেরণা এবং "সাহিত্যে যেখানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষ-কালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হোয়ে ওঠে সেখানেই সাহিত্যের অমরাবতী" (সাহিত্যের মূল্য—সাহিত্যের স্বরূপ), একথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। জীবন মহাশিল্পী আর সার্থক সাহিত্যিক মাত্রেই সেই মানবজীবনের রূপকার—এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের

সাহিত্য জিজ্ঞাসার মূলকথা। যে কথা দিয়ে শুরু করেছি, সে কথা দিয়েই শেষ করি—রবীন্দ্রনাথ মানবসংসারের শিল্পী, সেখানেই তিনি সাহিত্যসাধনার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। গভীর মানবপ্রেমজাত প্রত্যয়ে কবি স্থিতি লাভ করেছিলেন বলেই গভীর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে একথা উচ্চারণ করেছিলেন: "সাহত্য সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। তার মধ্যে রিপুর আক্রমণ এসে পড়ে, ভিতরে ভিতরে দুর্বলতার নানা চিহ্ন দেখা দিতে থাকে, মলিনতার কলঙ্ক লাগতে থাকে যেখানে সেখানে, কিন্তু তবু সকল হীনতা-দীনতাকে ছাড়িয়ে উঠে যে সাহিত্যে সমগ্রভাবে মানুষের মহিমা প্রকাশ না হয় তাকে নিয়ে গৌরব করা চলবে না, কেননা সাহিত্যে মানুষ আপনারই সঙ্গকে, আপনার সাহিত্যকে প্রকাশ করে স্থায়িত্বের উপাদানে। কেন না চিরকালের মানুষ বাস্তব নয়, চিরকালের মানুষ ভাবুক; চিরকালের মানুষের মনে যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কাজ করছে তা অভ্রভেদী, তা স্বর্গাভিমুখী, তা অপরাহত পৌরুষের তেজে জ্যোতির্ময়। সাহিত্যে সেই পরিচয়ের ক্ষীণতা যদি কোনো ইতিহাসে দেখা যায় তাহলে লজ্জা পেতে হবে, কেননা সাহিত্যে মানুষ নিজেরই অন্তরতম পরিচয় দেয় নিজের অগোচরে, যেমন পরিচয় দেয় ফুল তার গন্ধে, নক্ষত্র তার আলোকে। এই পরিচয় সমস্ত জাতির জীবনযজ্ঞে জালিয়ে তোলা অগ্নিশিখার মতো, তারই থেকে জ্বলে তার ভাবীকালের পথের মশাল, তার ভাবীকালের গৃহের প্রদীপ।" [সাহিত্যের তাৎপর্য্য—'সাহিত্যের পথে।'']।

এখানে সাহিত্যশাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথ 'প্রফেট'। প্রফেটের মতোই সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে মহত্তম সত্য উচ্চারণ করেছেন। বিদেশী সমালোচকের সমর্থন ভিক্ষা না করেই আমরা এই বাণীর মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারব এবং স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হব না, রবীন্দ্রনাথ জীবনশিল্পী ও সাহিত্যশাস্ত্রী, দুইরূপেই সমান বিরল কৃতিত্বের ভাগী।